CHANDO ALONKAR O-ADHUNIK BANGA KOBITA

BA [Bengali]

Paper - V

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Saikat Mondal

Assistant Professor, Derozio Memorial College, Rajarhat Road, R-Gopalpur, Kol-136.(WB)

Author

Dr. Aniruddha Biswas, Assistant Professor, Sreegopal Banerjee College, Bagati, Mogra, Hoogly, Pin-712148, (W.B)

Copyright © Reserved, 2017

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই - ম্যাপিং
প্রথম একক বাংলা ছন্দ	(পৃষ্ঠা 1-36)
দ্বিতীয় একক বাংলা অলংকার	(পৃষ্ঠা 37 - 66)
তৃতীয় একক সঞ্চিতা - কাজী নজরুল ইসলাম (নির্বাচিত কবিতা)	(পৃষ্ঠা 67 - 85)
চতুর্থ একক আধুনিক কবিতা	(পৃষ্ঠা 87 - 110)

সূচীপত্র

প্রথম একক (পৃষ্ঠা 1-35)

বাংলা ছন্দ

দ্বিতীয় একক (পৃষ্ঠা 35 - 66)

বাংলা অলংকার

তৃতীয় একক (পৃষ্ঠা 67 - 85)

সঞ্চিতা - কাজী নজরুল ইসলাম (নির্বাচিত কবিতা)

চতুর্থ একক (পৃষ্ঠা 87 - 110)

আধুনিক কবিতা

টিপ্পনী

ভূমিকা

টিপ্পনী

পঞ্চমপত্রের বিষয় হ'ল ছন্দ - অলংকার এবং বাংলা আধুনিক কবিতা। এই তিনটি বিষয়ই বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জগৎ - জীবনের সবেতেই ছন্দের প্রকাশ। তবে সাহিত্যে কেন নয়। সাহিত্যে ছন্দের প্রয়োজন তো আরোই দরকার। কেননা বর্ণ, শব্দ, অক্ষর, বাক্য নিয়ে তার কারবার। তাই তাকে এলোমেলো আগোছালো হলে চলে না। এখানে বাংলা ছন্দের প্রাথমিক সবকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে ছন্দো নির্ণয় সম্পর্কে। ছন্দের প্রকারভেদ সম্পর্কে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে প্রাচীনছন্দের কথা। আবার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কিম্বা মুক্তকও বাদ যায় নি। এই অংশটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা ছন্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে এবং সাহিত্যের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারবেন।

বাংলা অলংকার কেন, কি - তা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আমরা সর্বক্ষণই বাস্তব জীবনের কথা-বার্তায় অলংকার ব্যবহার করে চলেছি, অজান্তেই। লোক - জীবন, নাগরিক জীবন - সর্বস্তরেই অলংকারের সরাসরি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে ছাত্র - ছাত্রীরা অলংকার সম্পর্কে জানতে পারবে, সাহিত্যে কি ভাবে ব্যবহার করা হয় তাও জানতে পারবে এবং পাশাপাশি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত লেখক - লেখিকা অলংকার ব্যবহার করেছেন তাঁদের লেখায়। কাজেই বাংলা অলংকার বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেওয়ার জন্যই একে পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলা আধুনিক কবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করে এখানে পাঠ্যক্রম তৈরী হয়েছে। একটি অংশে আছে কবি নজরুলের কবিতা এখানে মূলত নজরুলের নির্বাচিত কিছু কবিতা আছে। যেগুলো মূলত বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সাম্যবাদীর কবিতায় আছে মানবতার কথা, আবার বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারিতে আছে রোমান্টিকতা। ভিন্ন স্বাদের , ভিন্ন আঙ্গিকে নজরুলেকে পাওয়া যায় এ কবিতাগুলোতে। আরপর আছে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - এঁদের কবিতা। প্রতিটি কবিতাই বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। আধুনিক থেকে অতিআধুনিক সময়কে ধরা হয়েছে এই কবিতাগুলোতে। সবমিলিয়ে আধুনিক বংলা কবিতায় একটি ক্রমবিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছ এখানে।

প্রথম একক

বাংলা ছন্দ

টিপ্পনী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'নিমের রাজত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন, এই বিশ্ব - ব্রহ্মান্ডের সর্বত্রই নিয়ম। কোথাও কোন নিয়ম বহির্ভূত কান্ড ঘটছে না। সর্বত্র নিয়ম দ্বারা বদ্ধ। কাজেই সেই সূত্র ধরে বলা যায় জাগতিক যা কিছু সবেতেই নিয়মের শাসন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায় তারও এক নিয়ম আছে, তবে না সে এত মনোহারী। সাহিত্যের এক বিশেষ উপাদান হ'ল ছন্দ। পদ্য রচনার এক বিশেষ রীতিই হল ছন্দ। এই ছন্দও নিয়মের দাসত্ব করে। তাই সে সুন্দর। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে -

> "সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নাম ছন্দ। আমাদের নিত্যকথিত বা পঠিত গদ্য ভাষার ধ্বনি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিতরূপে বিন্যস্ত করলেই পদ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়।"

আসলে ছন্দ হল একটা সুসমঞ্জস্ সৌন্দর্য। শ্রুতিমধুর শব্দের শিল্পময় বিন্যাস। যার আবেদন শ্রুতি ও চিত্তের কাছে।

এই ছন্দের অনেকগুলি উপাদান আছে। সেগুলি হল -

(১) ধ্বনি (বর্ণ, শব্দ)

(২) অক্ষর বা দল

(৩) মাত্রা বা কলা

(৪) ছেদ (অর্থ-যতি) ও যতি (ছন্দ-যতি)

(৫) লয়

(৬) পর্ব-পদ-চরণ-পংক্তি-স্তবক

(৭) পর্বাঙ্গ, অতিপর্ব অপূর্ণপদী পর্ব

(৮) মিল

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
1

অক্ষর বা দল :

একটি শব্দের যতটুকু ধ্বনি একবারে বা একঝোঁকে উচ্চারণ করা যায়, তাকেই বলা হয় অক্ষর। শব্দের পরমাণুকে বলা হয় অক্ষর। এককথায় বাগ্‌যন্ত্রের

টিপ্পনী

স্বল্পতম প্রয়াসে উৎপন্ন স্বরাশ্রিত ধ্বনিই হল অক্ষর বা দল। সংস্কৃতে অক্ষরকে 'দল' বলা হত। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনও দল ও অক্ষরকে সমার্থক মনে করেছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অক্ষরকে 'শব্দ পাপড়ি' নাম দিয়েছেন।

যেমন - 'মুক্তি' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দু'টি শব্দ পরমাণু পাওয়া যায়- মুক্-তি। এখানে 'মুক্' একটি অক্ষর বা দল এবং 'তি' একটি অক্ষর বা দল। কিম্বা 'অক্ষর' শব্দটিতে 'অক' ও 'খর্' - এই দুটি অক্ষর পাওয়া যায়।

এই অক্ষর বা দলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় -

(১) স্বরান্ত অক্ষর

(২) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর

(১) স্বরান্ত অক্ষর : (বিবৃত অক্ষর, মুক্তদল, Open Syllable) :

যে সমস্ত অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় (একক স্বরধ্বনি) তাদের স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তদল বলে। এই অক্ষর উচ্চারণ করতে গেলে মুখ প্রসারিত হয় বা খুলে যাব। সেইজন্য এদের বলা হয় বিবৃত অক্ষর।

যেমন - 'বিন্দু' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি অক্ষর পাওয়া যায় - 'বিন্' ও 'দু'। এখানে 'দু' (দ+উ) অক্ষরটি স্বরান্ত অক্ষর।

এই স্বরান্ত অক্ষরকে গঠনগত দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - (ক) মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর এবং (খ) যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর।

(ক) মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর :

যে অক্ষরের মৌলিক বা হ্রস্বস্বর থাকে, বা যে অক্ষর একক মৌলিক স্বর, তাকে মৌলিক স্বরান্ত বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর বলে।

যেমন - ভাষা শব্দটিতে 'ভা'(ভ+আ) এবং 'ষা' (ষ+আ) নামক দুটি অক্ষর আছে। দুটিতেই শেষে মৌলিক স্বরবর্ণ 'আ' বসেছে। কাজেই দুটি অক্ষরই এখানে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর।

(খ) যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর :

যে অক্ষরের শেষে যৌগিক স্বর থাকে, তাকে বলে যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর।

যেমন - 'সৌরভ' শব্দে 'সৌ' (ও+উ = ঔ) এবং 'রভ' দুটি অক্ষর। এখানে 'সৌ' হবে যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর। কিম্বা 'ভৈরব' এর 'ভৈ' (ও+ই = ঐ) হবে যৌগিক

স্বরান্ত অক্ষর।

(২) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (হলন্ত অক্ষর, রুদ্ধদল, সংবৃত অক্ষর, closed Syllable) :

যে সব অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাদের বলে ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর। অর্থাৎ যে সব অক্ষরের শেষে হসন্ত উচ্চারিত হয় সে অক্ষরগুলিকেই বলে হলন্ত অক্ষর।

যেমন - 'বন্ধন' শব্দে 'বন্' ও 'ধন্' দুটিই হলন্ত অক্ষর। কিম্বা পল্লবের 'পল্' ও 'লব্' দুটিই ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর। এগুলি উচ্চারণের সময় মুখ সংকুচিত হয়, কখনো বন্ধও হয়ে যায় (যেমন- 'পল্লব' এর 'লব') তাই একে সংবৃত অক্ষর বা রুদ্ধদল বলে।

একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে-

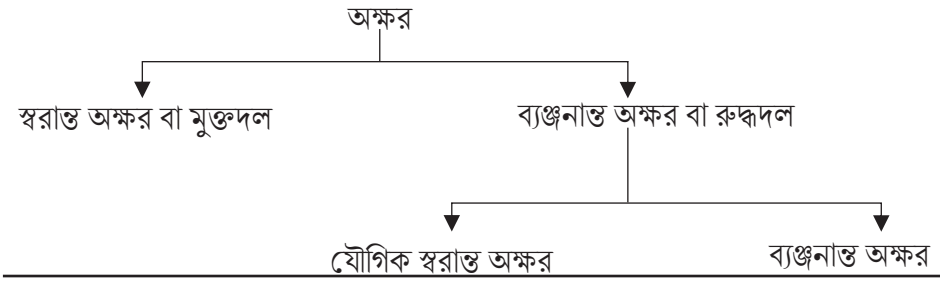

কলা বা মাত্রা :

একটি দল বা অক্ষর উচ্চারণ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে, সেই সময়টুকুকে বলে 'মাত্রা' বা 'কলা'। সংস্কৃতে মাত্রা বোঝাতে 'কলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Mora'। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মাত্রা বলতে 'unit' কে বুঝিয়েছেন। আসলে অক্ষর -ধ্বনি পরিমাণের মানদন্ড হল মাত্রা। এক একটি অক্ষর উচ্চারিত হতে যে সময় লাগছে তার ওপরই নির্ভর করছে তার মাত্রা। কাজেই বলা যায় মাত্রা হল ছন্দের অক্ষরের মাপক। 'একটি অনায়ত মুক্ত দলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম কলা।'

মাত্রা দুই ধরণের - একমাত্রা ও দুইমাত্রা।

একটি মুক্ত দল উচ্চারণ করতে সাধারণত যে সময় লাগে তাকে একমাত্রা ধরা হয়। একটি রুদ্ধদল উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তাকে 'দুমাত্রা' ধরা হয়। যেমন - 'ভারত' শব্দটিতে 'ভা' এবং 'রত' দুটি অক্ষর। 'ভা' উচ্চারণ করতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যতটা সময় লাগছে 'রত' উচ্চারণ করতে তার চাইতে বেশি সময় লাগছে। 'ভা'এর উচ্চারণ স্বাভাবিক। এটি মুক্তদল। তাই এর উচ্চারণ কালকে একমাত্রা ধরা হয়। 'রত' উচ্চারণে তুলনায় একটু বেশি সময় লাগছে। তাই এর উচ্চারণের সময়কালকে দুইমাত্রা ধরা হচ্ছে।

মাত্রা বা কলার চিহ্ন বা সংকেত বা প্রতীক :

বিভিন্ন ছান্দাসিক নানাভাবে মাত্রার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। সেগুলি হল -

(ক) একমাত্রা - অক্ষরের মাথায় এক দাঁড়ি। যেমন - দু, তি, রি

দুইমাত্রা - অক্ষরের মাথায় দুই দাঁড়ি। যেমন - মুক, বিন্, গৌ

(খ) রবীন্দ্রনাথ একমাত্রা একটি শূন্য (০) দিয়ে বুঝিয়েছেন।
যেমন - হে মোর চিত্ত / পুণ্য তীর্থে / জাগো রে ধীরে।

তবে দু' মাত্রা বোঝাতে নানা ধরনের চিহ্ন প্রয়োগ করেছেন যেমন -

১. হলন্ত অক্ষর পদের শুরুতে থাকলে তার চিহ্ন 'রেফ' - এর মতো (র্) হয়ে অক্ষরের মাথায় বসে।

২. হলন্ত অক্ষর পদের মধ্যে থাকলে অক্ষেরের মাথায় ড্যাস চিহ্ন (-) বসিয়েছেন তিনি।

৩. স্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হলে, দুমাত্রা বোঝাতে অক্ষরের মাথায় দুটি দাঁড়ি (।।) দিয়েছেন।

৪. পদান্ত হলন্ত অক্ষর চরণের ভেতরে থাকলে সেখানে (্) চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। শেষ শব্দটি হলন্ত হলে সেখানে হলন্ত অক্ষরের দ্বিতীয় বর্ণের মাথায় (ঃ) দুটি শূন্য বসেছে।

(গ) . অনেকে আবার ~এই চিহ্ন দিয়ে স্বরান্ত অক্ষরকে চিহ্নিত করেছেন। হলন্ত অক্ষর বোঝাতে '____' এই চিহ্ন দিয়েছেন। অনেকে একমাত্রা বোঝাতে অক্ষরের ওপর '১' এবং দু' মাত্রা বোঝাতে '২' লিখেছেন।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
4

ছেদ ও যতি :

ছেদ (অর্থ-যতি, বা ভাব যতি বা Sense Pause) :

বাক্যের আংশিক বা সামগ্রিক অর্থ প্রকাশের জন্য বাক্যের মধ্যে যে সাময়িক বা পূর্ণ উচ্চারণের বিরতি বা অবকাশ ঘটে, তাকে বলা হয় ছেদ।

আমরা কিছু বলার সময় বা বই পড়ার সময় একটানা কিছু বলিনা বা পড়িনা।

মাঝে মধ্যে থামতে হয়। বিরতি নিতে হয়। এই বিরতিই হ'ল 'ছেদ'। এই 'ছেদ' শব্দটি গদ্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে এই ছেদ নেওয়ার নির্দিষ্ট কিছু স্থান আছে। বাক্যের যে কোন স্থানে ছেদ নেওয়া যায় না। এমন ভাবে থামতে হয় যাতে বক্তার বক্তব্য শ্রোতার বোধগম্য হয়। ঠিক মতো না থামলে বাক্যের অর্থ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। যেমন - এখানে দাঁড়াবেন না। দাঁড়ালে শাস্তি হবে। এই বাক্যে ছেদ ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে বলে বাক্যটি বোধগম্য হয়েছে। একটু ওলট পালট করে ছেদ দিলে বাক্যটির সঠিক অর্থ পরিস্ফুট হবে না। যেমন -

এখানে দাঁড়াবেন। না দাঁড়ালে শাস্তি হবে।

কাজেই বাক্যে ছেদের প্রয়োজন আছে। দুটি কারণে এই ছেদ দেওয়া হয় - বাক্যের অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য এবং উচ্চারণের সময় শ্বাস নেওয়ার জন্য।

ছেদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - উপচ্ছেদ বা অর্ধচ্ছেদ এবং পূর্ণচ্ছেদ।

উপচ্ছেদ বা অর্ধচ্ছেদ :

বাক্যের অর্থকে বোঝানোর প্রয়োজনে বা শ্বাসবায়ু গ্রহণের কারণে যে সামান্য উচ্চারণ বিরতি ঘটে, তাকে উপচ্ছেদ বা অর্ধচ্ছেদ (caesura) বলে। এর প্রতীক চিহ্ন হ'ল - (*) তবে কমা(,), সেমিকোলন (;) প্রভৃতি চিহ্ন দিয়েও একে বোঝানো হয়।

যেমন -

যাক * সে সব কথা **

অমলার ঘরে বসে * সেই * আখোলা * চিঠি খুলে দেখি *

তাতে লেখা -*

তোমাকে দেখতে * বড্ড ইচ্ছে করছে' *

আর কিছু নেই।**

উপচ্ছেদের আবার দুই ভাগ - হ্রস্বচ্ছেদ ও মধ্যচ্ছেদ। হ্রস্বচ্ছেদ খুবই কম সময়ের জন্য বিরতি, যার চিহ্ন * আর মধ্যচ্ছেদ একটু দীর্ঘ বিরতি যার চিহ্ন সেমিকোলন (;)। তবে ছন্দে একে 'X' দিয়ে বোঝানো হয়।

পূর্ণচ্ছেদ :

বাক্যের অর্থ যথাযথ বা সম্পূর্ণ হলে পরে যে বিরাম চিহ্ন বসে, তাকে বলে পূর্ণচ্ছেদ (Final Pause)। বাক্যে একে এক দাঁড়ি (।) দিয়ে বোঝানো হয়। ছন্দের ক্ষেত্রে এর চিহ্ন হ'ল '**' বা '।।'। যেমন -

একটি * চন্দনকাঠের * বাক্সের মধ্যে * আমি তাঁর * চিঠিগুলি * রাখতুম *

টিপ্পনী

আর * রোজ * বাগান থেকে * ফুল তুলে * সেগুলি ঢেকে দিতুম **

যতি বা ছন্দোযতি (Metrical Pause) :

টিপ্পনী

ছন্দের নিয়মানুযায়ী ছন্দ তরঙ্গ সৃষ্টির প্রয়োজনে মূলত পদ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে ধ্বনি প্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি ঘটে, তাকে বলে যতি বা ছন্দোযতি।

কবিতা পড়ার সময় আমরা বিশেষ বিশেষ কিছু স্থানে থামি যাতে কবিতাটি শ্রুতিমধুর হয়, একটা দোলা তৈরী হয়। অনেক সময় দেখা যায় এমন জায়গায় থামতে হ'ল যে বাক্যের কোন অর্থ স্পষ্ট হ'ল না। তা সত্ত্বেও সেখানে থামতে হয়, ছন্দের খাতিরে। যেমন -

ফাল্গুনে। বিকশিত। কাঞ্চন। ফুল

ডালে ডালে। পুঞ্জিত। আম্র মুকুল।

এখানে প্রথম লাইনে 'ফাল্গুনে'-র পর থামছি, তারপর 'বিকশিত', 'কাঞ্চন' এবং 'ফুল' -এ থামচ্ছি। এই থামার স্থানগুলোতে যতি পড়েছে। কিন্তু তা অর্থবহ হয়নি। শুনতে ভালো লাগছে। ছন্দের দোলা তৈরী হয়েছে। ছন্দের প্রয়োজনেই এসব জায়গায় থামতে হয়েছে। এই থামার নামই ছন্দোযতি।

যতিকে দু'আগে ভাগ করা যায় - অর্ধযতি এবং পূর্ণযতি।

অর্ধযতি :

চরণের যে খন্ড অংশটুকু একবারে উচ্চারিত হবার ফলে বাক্যের অর্থবোধের সহায়ক হয় এবং এখানে যে বিরাম চিহ্ন পড়ে তাকে বলে অর্ধযতি। অর্ধযতির চিহ্ন *। উদাহরণ -

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে * গুণে মন ভোর **

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে * প্রতি অঙ্গ মোর **

পূর্ণযতি :

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
6

ছন্দের দোলা সৃষ্টিতে কবিতার লাইনের শেষে যে পরিপূর্ণ বিরতি পড়ে তাকে বলে পূর্ণযতি। এই পূর্ণযতি স্থাপনের ওপর ভিত্তি করেই ছন্দে পদ ও চরণ সংখ্যা গণনা করা হয়। কাজেই ছন্দের ক্ষেত্রে পূর্ণযতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণযতির চিহ্ন হ'ল '**'। যেমন -

শাশুড়ী ননদী নাই * নাই তোর সতা **

কার সনে দ্বন্দ্ব করি * চক্ষু কৈলি রাতা **

এছাড়া যতির ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে যতিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায় - ছন্দোযতি এবং ভাবযতি।

ছন্দোযতি (Metrical Pause) :

কবিতা পাঠের সময় ছন্দের প্রয়োজনে স্বল্প ও দীর্ঘ যে বিরাম পড়ে তাকে ছন্দোযতি বলা হয়। অর্ধযতি ও পূর্ণযতি উভয়ই ছন্দযতির অন্তর্গত। অর্ধযতির ক্ষেত্রে একটি স্টার (*) বা দাঁড়ি (।) আর পূর্ণযতিতে দুটি স্টার (**) বা দুটি দাঁড়ি (।।) দেওয়া হয়। যেমন -

গগনে গরজে মেঘ * ঘন বরষা **

কুলে একা বসে আছি * নাহি ভরসা **

ভাবযতি (Sense Pause):

বাক্যের অর্থকে পরিস্ফুট করার জন্য যে বিরতি তাই হ'ল ভাবযতি। কাজেই সবসময় ভাবযতি ও ছন্দোযতি একসাথে নাও পড়তে পারে। ভাবযতিকে 'XX' চিহ্ন দিয়ে এবং ছন্দোযতিকে '**' চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। একটি উদাহরণ -

নিশার স্বপনসম * তোর এ বারতা **

রে দূত ! XX অমরবৃন্দ * যার ভূজবলে **

কাতর, * সে ধনুর্ধরে * রাঘব ভিখারী **

বধিল সম্মুখ রণে ? XX ফুলদল দিয়া **

কাটিলা কি বিধাতা * শাল্মলী তরুবরে ** XX

এই উদাহরণে প্রতিটি চরণের শেষে ছন্দোযতি পড়লেও ভাবযতি পড়েছে 'দূত', 'রণে' এবং 'তরুবরে'র পরে। এই 'তরুবরে'-র পর ভাবযতি ও ছন্দোযতি একসাথে পড়েছে।

ছেদ ও যতির তুলনামূলক আলোচনা :

১. ছেদ ও যতি - এ দুই হ'ল উচ্চারণ বিরতি। ছেদের ব্যবহার গদ্যে এবং যতির ব্যবহার পদ্যে।

২. ছেদের বিরতি অর্থপ্রকাশক। অর্থ প্রকাশ না পেলে ছেদ হবে না। যতির বিরতি অর্থ প্রকাশের জন্য নয়। তা ছন্দের দোলা সৃষ্টির জন্য, যাতে শুনতে ভালো লাগে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৩. যতি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে পড়ে। তার কোন বিপর্যয় হয় না। হলে ছন্দপতন ঘটবে। আর ছেদ পড়বে অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে। যতি পড়ে ছন্দের নিয়মে ছেদ পড়ে অর্থের নিয়মে।

৪. ছেদের বিরতিতে জিহ্বা বিশ্রাম পায়। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে' ধ্বনি প্রবাহ স্বল্পক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ থেমে যায়। যতির বিরতিতে জিহ্বা বিশ্রাম পেলেও শ্বাসক্রিয়া চলে। ধ্বনি প্রবাহও চলে।

৫. পুরোনো রীতির বাংলা কবিতায় ছেদ ও যতি এক স্থানে পড়ে। কিন্তু আধুনিক কালের অনেক কবিতায় ছেদ ও যতি একসাথে পড়ে না।

৬. ছন্দের ক্ষেত্রে যতি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কবিতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর কবিতাতেই যতির ব্যবহার দেখা যায়।

পর্ব :

পর্ব নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন - চরণের একটি খন্ডিত অংশ হল পর্ব। বা দুটি যতির মধ্যস্থলের অংশকে পর্ব বলে। কিম্বা হ্রস্ব-যতির দ্বারা নির্দিষ্ট খন্ডিত ধ্বনিপ্রবাহকে পর্ব (Foot / Bar/ Measwre) বলে। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে -

"যতির দ্বারা নিয়মিতভাবে খন্ডিত,পদ্যের ছত্রে ছত্রে পুনরাবর্তনময় ধ্বনিমালার অংশই হল পর্ব।"

যেমন - চাঁদ উঠেছে। ফুল ফুটেছে। কদম তলায়। কে

হাতি নাচছে। ঘোড়া নাচছে। সোনামনির। বে।

এখানে দীর্ঘ দাঁড়ি (।) দিয়ে পর্বকে ভাগ করা হয়েছে। 'চাঁদ উঠেছে', 'ফুল ফুটেছে', 'কদম তলায়' হল এক একটি পর্ব।

পর্বাঙ্গ :

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
৪

পর্বের ক্ষুদ্র অংশ হ'ল পর্বাঙ্গ। কবিতা পাঠকালে তার প্রতিটি পর্বে কণ্ঠস্বরের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, যাতে পর্বে যে দুটি বা তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ অস্পষ্ট অনুভূত হয়, তাদের এক একটিকে পর্বাঙ্গ (Beat) বলে।

প্রতিটি পর্বে কমবেশি তিন থেকে চারটি পর্বাঙ্গ থাকে। কখনো কখনো দুটি পর্বাঙ্গ নিয়েও একটি পর্ব গঠিত হতে দেখা যাব। দুটি পর্বাঙ্গের মধ্যে কখনো যতি চিহ্ন পড়ে না। যতি চিহ্ন পড়ে পর্বের শেষে। উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বরের ওঠা নামা থেকে পর্বাঙ্গকে চেনা যায়। পর্বাঙ্গের পরে (ঃ) এই রকম দুটি বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন -

বেলা যে : পড়ে এল। জলকে : চল।।

এখানে প্রতিটি পর্বাঙ্গের শেষে (:) এই বিন্দু চিহ্ন বসেছে। এবং একটি পর্বে দুটি করে পর্বাঙ্গ আছে। পর্বাঙ্গের দৈর্ঘ্য এক থেকে চারমাত্রার মধ্যেই থাকে। তার বেশি হয় না।

লয় :

টিপ্পনী

'লয়' আসলে কবিতা পাঠের গতিকে বলে। প্রবাহিত ধ্বনিস্রোতের উচ্চারণ গতির নাম হ'ল লয়। কবিতা পাঠের সময় লাইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠের স্বাভাবিক গতি থেকে যে সুর অনুভূত হয় তাই হল লয়।

বাংলা কবিতায় তিন রকমের লয় পাওয়া যায় - ধীর লয়, মধ্যম লয় এবং দ্রুত লয়।

ধীর লয় :

যে ছন্দের স্পন্দন ধীর, বিলম্বিত বা মৃদু চলনের সেখানে ধীর লয় অনুভুত হয়। যে কবিতার পূর্ণ পর্বগুলি বড় বড় অর্থাৎ ৮ বা ১০ মাত্রার সেগুলি ধীর লয়ের। চেষ্টা করেও তা দ্রুত পড়া যায় না। অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের লয় হ'ল ধীর। যেমন -

১১১১ ১১ ২ ১১১ ১ ২
ধরিল না বাহু মোর। রুধিল না দ্বার ৮+৬

১১ ১১১১ ২ ১১ ১১ ২
শুধু নিজ হৃদয়ের। স্নেহ অধিকার ৮+৬

এর লয় ধীর।

মধ্যম লয় :

মাঝামাঝি গতিতে যে কবিতা পাঠযোগ্য তাই হ'ল মধ্যম লয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক গতির তুলনায় কিছুটা বেশি গতিময় কবিতার লয় হ'ল মধ্যম। যে কবিতা পর্ণপর্ব বড়ও নয়, আবার ছোটও নয়, মাঝারি বা ৫, ৬ কিম্বা ৭ মাত্রার তার লয় মধ্যম। এই লয়ের ছন্দের নাম কলাবৃত্ত বা মাত্রাবত্ত। যেমন -

১ ২ ১১ ১১ ১১ ১ ১১ ২
ফাগুন এল দ্বারে। কেহ যে ঘরে নাই ৭ + ৭

১ ২ ১১ ১ ১ ১১১ ১১ ২
পরাণ ডাকে কারে। ভাবিয়া নাহি পাই ৭+৭

এখানে গতি মধ্যম। এটি কলাণবৃত্তের উদাহরণ।

টিপ্পনী

দ্রুত লয় :

যে কবিতা পাঠের গতি দ্রুত অর্থাৎ স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি। সেই লয়কে বলে দ্রুত লয়। এই কবিতার পূর্ণপর্বগুলি ছোট ছোট। এর মাত্রা ৪। দ্রুত লয়ের ছন্দের নাম দলবৃত্ত ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দ। যেমন -

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
আরে মেলো। গাধাগুলো। একেবারে। অন্ধ, ৪+৪+৪+২

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বোঝে নাকো। কোনো কিছু। খালি করে। দ্বন্দ্ব ৪+৪+৪+২

বোঝাই যাচ্ছে আগের দুটো কবিতার তুলনায় এর গতি বেশি। এই রকম গতির নামই ছন্দের ক্ষেত্রে দ্রুত লয়। দলবৃত্ত ছন্দেই একমাত্র দ্রুত লয় অনুভূত হয়।

চরণ : (Metrical Line)

চরণের সংজ্ঞা নানা ছান্দসিক নানা ভাবে দিয়েছেন। ফলে এক্ষেত্রে ও বহুমত লক্ষ্য করা যায়। অনেকে চরণ, পংক্তি, পদ বা পাদ সমার্থক মনে করেছেন।

পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ ধ্বনি প্রবাহকে চরণ বলে। চরণ একাধিক পর্বে গঠিত। সোজা হিসেবে বলা যায় কবিতার ক্ষেত্রে বাক্যের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অংশকে বলে চরণ। যেমন -

পাখি সব করে রব। রাতি পোহাইল।।

কাননে কুসুমকলি। সকলি ফুটিল।।

এখানে 'পাখি' থেকে 'পোহাইল' পর্যন্ত একটি চরণ এবং 'কাননে' থেকে 'ফুটিল' পর্যন্ত আরেকটি চরণ।

স্তবক (Stanza) :

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
10

চরণগুচ্ছের নাম স্তবক। একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশক, একাধিক চরণের সুসংযত গুচ্ছবদ্ধ রূপ হল 'স্তবক'। একটি কবিতার বিষয় কবিতাটির স্তবকগুলির মধ্যে খন্ড খন্ড ভাবে পরিবেশিত হয়। সমগ্র বক্তব্যের এক একটি অংশ পূর্ণরূপে এক একটি স্তবকে প্রকাশ পায়। যেমন -

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ভরা পালে চলে যায়,

কোনো দিকে নাহি চায়

ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে।

এটি পাঁচ চরণের স্তবক । এই স্তবকে একটি খন্ড ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে।

টিপ্পনী

বাংলা ছন্দের জাতি বিচার :

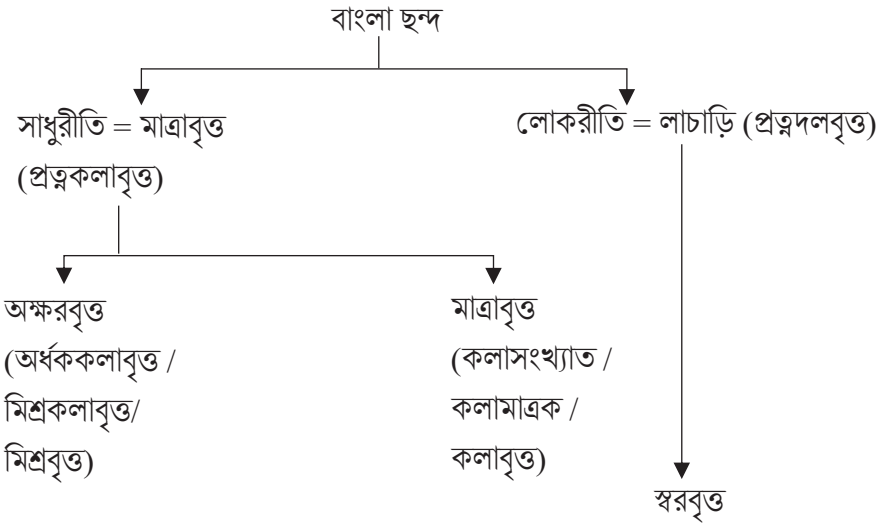

বাংলা তিন জাতীয় ছন্দের নাম বৈচিত্র্য আরো বিস্তৃত ভাবে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

প্রাচীন নাম (?)	পয়ার	লাচাড়ি	ধামালি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সমমাত্রার ছন্দ	অসমমাত্রার ছন্দ	বিষমমাত্রার ছন্দ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	আদ্যা	হৃদ্যা	চিত্রা দৃপ্তা মঞ্জু
প্রবোধচন্দ্র সেন	অক্ষরবৃত্ত / মিশ্রবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত / কলাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত / দলবৃত্ত
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	তানপ্রধান / ধীরলয়	ধ্বনিপ্রধান /বিলম্বিত লয়	শ্বাসাঘাত প্রধান
রাখালরাজ রায়	অক্ষর মাত্রিক	মাত্রাবৃত্ত	স্বরমাত্রিক
কালিদাস রায়	অক্ষর মাত্রিক	স্বরমাত্রিক	দলমাত্রিক
আব্দুল কাদের	অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত

টিপ্পনী

তারাপদ ভট্টাচার্য	অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	বলবৃত্ত
মোহিতলাল মজুমদার	বর্ণবৃত্ত পদভূমক	মাত্রাবৃত্ত / পর্বভূমক	অক্ষরবৃত্ত
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য	ভঙ্গ প্রাকৃত	শুদ্ধ প্রাকৃত	দেশজ
সুকুমার সেন	তদ্ভব / তানপ্রধান	তৎসম / মানপ্রধান	অর্ধতৎসম / তাল প্রধান
পরেশচন্দ্র ভট্টাযার্য	তদ্ভব ও অক্ষরবৃত্ত	অর্ধ তৎসম	দেশি ও স্বরবৃত্ত

অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ :

আচার্য প্রবোধ চন্দ্র সেন সর্বপ্রথম 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ নাম ব্যবহার করেন। এই ছন্দের সংজ্ঞায় বললা যায় -

"চোখের দেখা অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য বিযুক্ত বা যুক্ত অক্ষরকে একটিমাত্র মাত্রা হিসেবে গণনা করে যে ছন্দের যাবতীয় বিশ্লেষণ সম্ভবপর অথবা যে - জাতীয় ছন্দে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরকেই মাত্রা গণনার এককরূপে গ্রহণ করা হয়, তাকেই বলা চলে 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ। অথবা বলা চলে, যে জাতীয় ছন্দে একমাত্র পদান্তিক রুদ্ধদলই শুধু দ্বিমাত্রক, এছাড়া যাবতীয় রুদ্ধদল এবং সর্বপ্রকার মুক্তদল একমাত্রা বিশিষ্ট তাকেই বলা হয় 'অক্ষরবৃত্তছন্দ'।

এই ছন্দে অক্ষর গণনার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পদের প্রতিটি অক্ষরকে একমাত্রায় গণনা করা হয়, কেবল অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দু'মাত্রায় গণনা করা হয়। 'অক্ষরবৃত্ত' নামটি প্রথম প্রবোধচন্দ্র সেন ব্যবহার করলেও পরে তা তিনি প্রত্যাহার করেন। কারণ তিনি মনে করেন - সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ আর বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এক প্রকৃতির ছন্দ নয়। তাছাড়া অক্ষর গণনার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অক্ষরকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ছন্দ আসলে যৌগিক বা মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ। তাই প্রবোধচন্দ্র সেন এর নামকরণ করলেন - 'যৌগিক ছন্দ'। পরবর্তীতে তিনি এই নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক' ছন্দ। এই নামও বদল করে তিনি রাখেন 'মিশ্রকলাবৃত্ত' ছন্দ। এই নামকরণের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন - এই রীতির ছন্দে প্রধানত শব্দের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদলের উচ্চারণ হয় সংকুচিত (সংশ্লিষ্ট) ও এককলা-পরিমিত এবং শব্দের অন্তঃস্থিত রুদ্ধদলের উচ্চারণ হয় প্রসারিত (বিশ্লিষ্ট) ও দুইকলা পরিমিত।

এই ছন্দকে কোন কোন ছান্দসিক তানপ্রধান ছন্দ নামে অভিহিত করেছেন।

তাঁদের মতে এই ছন্দে অক্ষরের স্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া এই ছন্দে তান প্রবাহের ধীরতার কারণে লঘু-গুরু অক্ষরের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য অনুভুত হয়। তাই এই ছন্দের নাম তান প্রধান ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এই ছন্দের নাম 'সাধুভাষার ছন্দ' হওয়া উচিত। কারণ সাধুভাষার বনিয়াদের ওপর এই ছন্দের ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

টিপ্পনী

মধ্যযুগের প্রায় সমগ্র সাহিত্য এবং আধুনিক যুগের সাহিত্যের একটা বড় অংশ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই ছন্দ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(১) এই ছন্দে অক্ষর ও পর্বের সমতা লক্ষ্য করা যায়। যত অক্ষর তত মাত্রা। পদান্তস্থিত রুদ্ধ দল। একক রুদ্ধদল দু' মাত্রার হয় এবং পদের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধ দল ও সব মুক্ত দল এক মাত্রার হয়। উদাহরণ -

অক্ষরের হিসাবে

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
মহা ভা র তে র ক থা । অ মৃ ত স মা ন। ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
কা শী রা ম দা স ভনে । শো নে পু ণ্য বা ন্।। ৮ + ৬

দলের হিসাব -

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
মহা ভা র তে র ক থা । অ মৃ ত স মা ন। ৮ + ৬

১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
কা শী রা ম দা স ভনে । শো নে পু ণ্য বান্।। ৮ + ৬

কবিতাটি পড়ার সময় যদি পদের শেষে হসন্ত উচ্চারণ না করে স্বরান্ত উচ্চারণ করা হয় অর্থাৎ রুদ্ধ দলের পরিবর্তে মুক্ত দলরূপে পাঠ করা হয়, তাতে মাত্রাদান পদ্ধতিতে সামান্য পরিবর্তন দেখা গেলেও পর্বের মাত্রা - সংখ্যার কোন হেরফের হয় না দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে রুদ্ধদলকে মুক্তদল রূপে পাঠ করলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কোন অসুবিধা হয় না, কাজেই এটাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য বলে মান্যতা দেওয়া হয়।

(২) এই ছন্দে স্বরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ বিচারের কোন সুযোগ নেই। কারণ

টিপ্পনী

তান প্রাধান্যের ফলে এ ছন্দের চলন মৃদু। তানের প্রাধান্যের কারণে যুক্তাক্ষর একমাত্রায় সংকুচিত হয়ে পড়ে। যেমন -

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
বা জি ল রা ক্ষ স বা দ্য, না দি ল রা ক্ষ স

(৩) এই ছন্দের লয় ধীর।

(৪) এই ছন্দে পর্বের দৈর্ঘ্য অন্যান্য ছন্দের তুলনায় বেশি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পর্বের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৬, ৮ ও ১০ মাত্রার হয়। কখনো ৪ মাত্রার হয়।

(৫) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর স্থিতিস্থাপক গুণ। অর্থাৎ এর সংকোচন ও প্রসারণের ক্ষমতা আছে। অতিরিক্ত শব্দ ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন এই ছন্দে তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব প্রভৃতি শব্দ সহজেই ব্যবহার করা যায়। যেমন -

'দুর্দান্ত পান্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' - এখানে ১৪ মাত্রা, ১৪ অক্ষর, ২৩ টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ১৪ টি স্বরধ্বনি আছে - অন্য কোন ছন্দে ১৪ মাত্রার মধ্যে এত বেশি বর্ণসংস্থাপন করা যেত না। নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে প্রায় যতখুশি ধ্বনির সমাবেশ ঘটানো সম্ভব বলে রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্যকে বলেছেন, 'পয়ারের শোষণশক্তি'।

(৬) মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে গঠন বৈচিত্র্য বিশিষ্ট নানা ছন্দের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। কেননা এই ছন্দ ধীর লয়ের ছন্দ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একপদী থেকে চৌপদী, পয়ার ও তার নানা রূপভেদ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, মুক্তক ছন্দ, গদ্যছন্দ প্রভৃতি।

(৭) এই ছন্দের চলন সংযত, ধীর বলে গদ্যের সঙ্গে এর দুরত্ব কম। তাই এই ছন্দে জীবনীধর্মী গ্রন্থ, মহাকাব্য প্রভৃতি রচিত হয়।

(৮) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্বের আকার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলে অনেকে এই পর্বকে 'পদ' নামে অভিহিত করেন এবং এই ছন্দকে বলেন 'পদভাগের ছন্দ'।

মাত্রাবৃত্তছন্দ, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, কলাবৃত্ত ছন্দ :

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
14

যে ছন্দে যে কোন রুদ্ধদলের মাত্রাসংখ্যা দুই এবং যার চলন নাতিচপল অথবা নাতিধীর অর্থাৎ এককথায় যার চলন বা গতি মধ্যম তাকে বলা যেতে পারে মাত্রাবত্ত ছন্দ। বাংলার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বে অক্ষরসমতা বর্তমান থাকে, স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বে স্বর-সমতা বর্তমান থাকে আর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বে শুধু মাত্রা-সমতাই বর্তমান থাকে, অপর কিছুই নয়, এই কারণেই এ জাতীয় ছন্দের 'মাত্রাবৃত্ত' নামকরণ যথাযথ ও সার্থক।

এই ছন্দের নামকরণ করেছিলেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন । তিনি বলেছিলেন -

> "ধ্বনির পরিমান বা quantity -র উপর ভিত্তি করে যে ছন্দ রচিত হয় তারই নাম মাত্রাবৃত্ত ; কারণ মাত্রা সংখ্যা স্থির রাখাই হচ্ছে ধ্বনি পরিমাণ স্থির রাখার উপায়।"

পরবর্তীকালে তিনি 'মাত্রা'র গুরুত্ব অস্বীকের করে এই ছন্দের নাম রাখলেন 'কলাবৃত্ত' ছন্দ । তিনি মাত্রাবত্তের পক্ষপাতী নন কেন ? তার বাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন -

> "মাত্রাবৃত্ত নামটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট । সব রীতির ছন্দেই তো মাত্রাসংখ্যাত । তাই শুধু এক রীতির ছন্দকে 'মাত্রাবৃত্ত' বলা অসংগত । তা ছাড়া, এই নাম থেকে এ রীতির ছন্দের মূল উপাদানের স্বরূপ জানা যায় না - যেমন জানা যায় কলাসংখ্যাত, কলামাত্রক ও কলাবৃত্ত নাম থেকে । অতএব মাত্রাবৃত্ত নামটাও নির্দোষ পরিভাষা হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্য নয়।"

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ছন্দকে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কারণ এই ছন্দে 'উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি পরিমাণই প্রধান ।' আবার কোন কোন ছান্দসিক এই ছন্দকে 'সরল কলামাত্রিক ছন্দ বলে অভিহিত করেছেন। তার কারণ এর মাত্রা গণনায় সহজ ও স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করা হয় । আবার বেশির ভাগ গীতিকবিতা এই ছন্দে রচিত হয়েছে বলে একে কেউ কেউ 'গীতিধর্মী' ছন্দ বলেছেন। আর একটি নামও প্রাচীন সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে কোন কোন অংশে বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মিল দেখা যায়।

এই কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দুটি রূপ। তা হল - (ক) প্রত্নকলাবৃত্ত এবং (খ) নব্য কলাবৃত্ত।

(ক) প্রত্নকলাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্নাত্রাবৃত্ত ছন্দ :

উৎপত্তির দিক দিয়ে এই ছন্দকে প্রায় 'তৎসম' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত অনেক ছন্দের নিয়ম মেনে চলে এই ছন্দ । সংস্কৃত ও প্রাকৃত নিয়মে রুদ্ধদল মাত্রই দ্বিমাত্রক এবং যৌগিক স্বর ও দীর্ঘস্বরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রক । তবে বাংলায় দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা সব সময় মেনে চলা হয় না । বাংলা মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে এই প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান তফাৎ এই যে, মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা একেবারেই নেই, প্রত্নমাত্রাবৃত্তে অনেক সময়ই দ্বিমাত্রকতা থাকে ; অবশ্য সবসময় নাও থাকতে পারে । সে কারণেই 'প্রত্নমাত্রাবৃত্ত' কে 'তৎসম' এবং 'মাত্রাবৃত্ত' কে 'অর্ধতৎসম' নাম দেওয়া হয়েছে । প্রাগাধুনিক বাংলা ভাষায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রত্নমাত্রাবৃত্তের ব্যবহারই দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যে খাঁটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চর্যাপদ, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণবপদাবলীর ছন্দ প্রত্নমাত্রাবৃত্ত। আবার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও এই প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দের দেখা মেলে। এখানে অবশ্য বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে নয়, সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত রূপেই বাংলায় দু'একটা নিদর্শন তৈরী করা হবেছে।এই প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য গুলি হল -

(১) প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্ন-কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত কবিতা গেয়। কাজেই এখানে সুরের অধীন ছিল মাত্রা গণনার স্বাধীনতা।

(২) এই ছন্দে ক্ষেত্র বিশেষে স্বরান্ত অক্ষর এবং সবসময় রুদ্ধদল, হলন্ত অক্ষর, যৌগিক স্বর যুক্ত অক্ষর দু'মাত্রায় গণনা করা হ'ত।

(৩) পয়ারের মত সুর-নির্ভর এ ছন্দের ধ্বনিমাত্রার সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা ছিল।

(৪) ৪ মাত্রা থেকে ১০ মাত্রা পর্যন্ত পর্ব থাকত এ ছন্দে। তবে পর্বের আকার সাধারণত ছোট হত।

(৫) ধ্বনিঝংকারময়তা এ ছন্দের প্রাণ।

(৬) এর লয় মধ্যম।

(খ) নব্য-কলাবৃত্ত ছন্দ :

আধুনিক কলাবৃত্ত ছন্দই হ'ল নব্য - কলাবৃত্ত ছন্দ । এই রীতির ছন্দ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল প্রকৃতির। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(১) এখানে সুরের প্রাধান্য থাকে না।

(২) পয়ারের মত শোষন শক্তি নেই এ ছন্দে, নেই প্রবমানতা । তবে রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দে কিছুটা প্রবহমানতা এনেছেন।

(৩) ৪ থেকে ৮ মাত্রা পর্যন্ত পর্ব থাকে এ ছন্দে।

(৪) এ ছন্দকে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলে।

(৫) পয়ার, তরিপদী, চৌপদী, প্রবহমান মহাপয়ার, মুন্ডক প্রভরতি নানা ধরনের ছন্দোবদ্ধ লক্ষিত হয় নব্য-কলাবৃত্ত রীতিতে।

(৬) এই রীতিতে সব ক্ষেত্রে মুক্তদল এক মাত্রার এবং যুগ্মধ্বনি ও রুদ্ধদল দু'মাত্রার হয়।

(৭) এই ছন্দে সুরবৈচিত্র্য যথেষ্ট প্রকাশ করা গেলেও গাম্ভীর্য আনা সম্ভব নয় । কাজেই এ ছন্দ গীতি কবিতার পক্ষে উপযোগী । অমিত্রাক্ষর

কবিতার উপযোগী নয়।

স্বরবৃত্ত ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ, বলবৃত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ :

টিপ্পনী

উৎপত্তির দিক থেকে 'দেশি' বা 'দেশজ' এবং ব্যবহারের দিক থেকে 'লৌকিক' ছন্দকেই বলে 'স্বরবৃত্ত' ছন্দ। এর নামকরণ করেন আচর্য প্রবোধ চন্দ্র সেন। তিনি এর নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন -

"এ ছন্দ প্রতি চরণের অন্তর্গত অক্ষর সংখ্যার বা মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর না করে স্বরসংখ্যার উপর নির্ভর করছে, সেহেতু এ ছন্দকে 'স্বরবৃত্ত' নাম দেওয়া সঙ্গত মনে করি।"

এই মতকে মান্যতা দিয়ে এর সংজ্ঞায় বলা যায় -

"যে ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা তার স্বরসংখ্যার সমান, তাকে বলা যায় স্বরবৃত্ত ছন্দ।"

মূলত এই জাতীয় ছন্দে প্রতি পর্বে শুধু স্বরবর্ণের সংখ্যাই গণনীয়, শুধু ব্যঞ্জন অর্থাৎ হসন্তযুক্ত বর্ণ বর্জিত হলেও ছন্দের দিক থেকে এর কোন ক্ষতি হয় না। একটা উদাহরণ দিয়ে একে বোঝানো যেতে পারে -

।o। । । । ।o। ।o । ।o । । । ।o
বিষ্‌টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদেয়্‌ এলো। বান্‌

।o । । । । । । । । ।o। ।o। । ।o
শিব ঠাকুরের। বিয়ে হবে। তিনটি কন্‌নে। দান্‌

এই উদাহরণে যে সব অক্ষরে হস্‌চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে বাদ দিলে অর্থবোধে বিপত্তি ঘটতে পারে, কিন্তু ছন্দেরক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকে না -

। । । । । । । । । । । । । ।
বিটি পড়ে। টাপু, টুপু। নদে এলো। বা

। । । । । । । । । । । । । ।
শিঠাকুরে। বিয়ে হবে। তিটে কনে। দা

শুদ্ধ স্বরগুলোকে বজায় রাখলেই ছন্দের স্বরূপটি বোঝা যাচ্ছে বলে এর নাম 'স্বরবৃত্ত' হয়েছে।

এই ছন্দের আরো অনেক নাম আছে। সে নামগুলির পেছেনে আছে এ

ছন্দের এক একটি বিশেষ লক্ষ্মণ। সেই নামগুলি হ'ল - শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ, বলবৃত্ত ছন্দ, স্বরবৃত্ত ছন্দ, দলবৃত্ত ছন্দ, প্রাস্বরিক ছন্দ, পাপড়ি-গোনা ছন্দ, ছড়ার ছন্দ ও লৌকিক ছন্দ।

টিপ্পনী

এই ছন্দের কোন বিশেষ অক্ষরে ঝোঁক পড়ার ফলে নিঃশ্বাস বায়ু সজোরে স্বরযন্ত্রে আঘাত করে। এই ঝোঁককে বলে শ্বাসাঘাত। এই ছন্দে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বলে একে স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলে। এই নামকরণ করেছেন ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। আবার এ ছন্দের প্রতি পর্বে প্রবল প্রস্বর বা ঝোঁক পড়ে বলে একে কলাবৃত্ত ছন্দ বলা হয়। আমরা আগেই দেখিয়েছি, স্বরধ্বনির প্রাধান্য থাকে বলে একে স্বরবৃত্ত বলা হয়। আবার একে দলবৃত্ত ছন্দও বলা হয়। কারণ এ ছন্দের পর্বে অক্ষর বা দল সংখ্যাই হল এর মাত্রা সংখ্যা। প্রতি পর্বের শুরুতেই প্রবল ঝোঁক বা প্রস্বর থাকার কারণে এর নাম প্রাস্বরিক ছন্দ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আবার এই ছন্দের নামকরণ করেছেন পাপড়ি-গোণা ছন্দ। পাপড়ি অর্থাৎ দল। দলের সংখ্যার ওপর পর্বের মাত্রা নির্ভর করে বলে একে বলা হয় পাপড়ি গোনা ছন্দ। ছড়া মূলত এই ছন্দেই লেখা হয়। তাই এর নাম ছড়ার ছন্দ। অন্যদিকে লোক সাহিত্যের মধ্যে এই ছন্দের ব্যবহার থাকায় একে লৌকিক ছন্দও বলা হয়। এই ছন্দেই মধ্যযুগের 'ধামালি সঙ্গীত' রচিত হ'ত বলে অনেকে একে 'ধামালি ছন্দ' ও বলেন।

স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

(১) এই ছন্দে সাধারণত প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণপর্ব এবং একটি অপূর্ণ পর্ব থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও ঘটে। এর প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪। এর কোন কম বেশি হয় না। স্বরবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধ ও মুক্ত উভয় দলই একমাত্রার হয়। এমনকি হ্রস্ব, দীর্ঘ বা যৌগিক স্বর সবই একমাত্রা বিশিষ্ট হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক -

১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
এ গোঁফ যদি। আমার বলিস। করবো তোকে। জবাই ৪ + ৪ + ৪ +২

১ ১ ১১ ১১১১ ১ ১ ১১ ১ ১
এই না বলে। জরিমানা। করলেন তিনি। সবার। ৪+৪+৪+২

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
18

১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ভীষণ রেগে। বিষম খেয়ে। দিলেন লিখে। খাতায় ৪+৪+৪+২

১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১
কাউকে বেশি। লাই দিতে নেই। সবাই চড়ে। মাথায়, ৪+৪+৪+২

(২) এই ছন্দে শ্বাসাঘাত প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে এক অপূর্ব নৃত্য

চঞ্চল সুরের দোলা তৈরী হয় কাব্যে যা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। যেমন -

দেখ বাবাজি। দেখবি নাকি। দেখরে খেলা। দেখ চালাকি,

ভোজের কাজি। ভেল্কি ফাঁকি। পড়্ পড়্ পড়্। পড়বি পাখি। ধপ।

লাফ দিয়ে তাই। তালটি ঠুকে। তাক করে যাই। তীর ধনুকে,

ছাড়ব সটান। ঊর্ধ্বমুখে। হুস করে তোর। লাগবে বুকে। খপ।

উদ্ধৃত অংশগুলোতে প্রতি পর্বের আদিতে একটি প্রবল প্রস্বর (accent) অনুভূত হয়। আবার এমন অনেক স্বরবৃত্ত ছন্দ আছে৪ যেখানে পর্বের আদিতে কোন প্রস্বর অনুভূত হয় না। বরং হলেই সেখানে শ্রুতিকটূ শোনাবে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :-

কৃষ্ণকলি। আমি তারেই। বলি
কালো তারে। বলে গাঁয়ের। লোক।
মেঘলা দিনে। দেখেছিলাম। মাঠে,
কালো মেয়ের। কালো হরিণ। চোখ।

এই কবিতা একটু সুর করে পড়তেই ভালো লাগে। প্রস্বর দেওয়ার কোন সুযোগ এতে নেই।

(৩) এই ছন্দের গাম্ভীর্য কম কারণ এতে পয়ারের মত শোষণ শক্তি নেই। ধ্বনি প্রসারণ ঘটে খুব কম।

(৪) স্বরবৃত্ত ছন্দের লয় দ্রুত। কেননা প্রতি পর্বে সুনির্দিষ্ট চারটি মাত্রা থাকে। তাই দ্রুত যতিপাত ঘটে।

(৫) এই ছন্দের সুরের দোলার সাথে সাথে মিলের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে শিশুমনকে এ ছন্দ গভীরভাবে টানে।

ছন্দোলিপি / ছন্দো বিশ্লেষণের নিয়ম :

ছন্দ নির্ণয় করতে গেলে যেমন কান তৈরি হওয়া দরকার, তেমনি কিছু প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কৌশলও জানা দরকার।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রথমেই দরকার দল সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা। কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করলে এক এক প্রচেষ্টায় তার যতটুকু করে উচ্চারণ করা যায়, তটুকু এক একটা দল বা Syllable। একটা দলে একটাই স্বরবর্ণ থাকে। তাকে আশ্রয় করেই এক একটা দল গড়ে ওঠে। একটা দলে অবশ্য ব্যঞ্জনবর্ণ থাকতে পারে একাধিক কিংবা একটাও নয়। মুক্, তি, বিন, দু, গৌ, রী - এদের প্রতিটি এক একটি দল। একটি দলে একাধিক স্বরবর্ণ থাকলেও তা একই প্রচেষ্টায় উচ্চারিত হবে। যেমন - যায়, নাই, দাও ইত্যাদি।

এই দল গণনা হবে উচ্চারণের ওপর নির্ভর করে। বানান দেখে নয়। কেননা অনেক সময় 'ঘর', জ্বর, 'জল' ইত্যাদি শব্দ লিখলেও তাতে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া হয় না। কিন্তু উচ্চারণ করলে তার অস্তিত্ব বোঝা যায়। তাই এদের প্রত্যেকটি এক একটি দল। 'বিদ্যালয়' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় - বিদ. দা. লয়। এখানে দল তিনটি। এর মধ্যে 'দা' ও 'লয়' স্বরান্ত 'বিদ' ব্যঞ্জনান্ত। স্বরান্ত দলের নাম মুক্তদল ও ব্যঞ্জনান্ত দলের নাম রুদ্ধদল। 'লয়', 'দাও' ইত্যাদি শব্দকে আমরা একসাথে উচ্চারণ করি। এখানে দাও (আ+ও) যৌগিক স্বরান্ত। লয় (অয়) যৌগিক স্বরান্ত। যৌগিক স্বর সর্বদাই রুদ্ধদল হবে।

যখন কোন ছন্দে সব রুদ্ধদল উচ্চারণ সম্প্রসারিত অর্থাৎ দ্বিমাত্রক তখন হয় 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দ'। পদান্তের রুদ্ধদল সম্প্রসারিত বা দ্বিমাত্রক, কিন্তু পদের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদল সম্প্রসারিত নয় এবং উচ্চারণ একমাত্রক, তখন তা 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দ'। আর যখন সব রুদ্ধদলের উচ্চারণই সংশ্লিষ্ট এবং একমাত্রাবিশিষ্ট তখন হয় 'স্বরবৃত্ত' ছন্দ। প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছাড়া অন্য তিন প্রকার ছন্দেই মুক্তদল একমাত্রার হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রতি পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪, ৫, ৬ ও ৭ হয়। কখনো ৮ হয়। অক্ষরবৃত্তে মাত্রা ৬, ৮ বা ১০ হয় কখনো ৪ মাত্রার হয়। অক্ষরবৃত্তে বিজোড় মাত্রাসংখ্যা কখনো স্থান পায় না। স্বরবৃত্ত ছন্দের পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা সর্বদাই ৪, দল ও ৪। কখনো দলের সংখ্যা হেরফের হলে মাত্রা সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিয়ে ৪ মাত্রায় আনা হয়।

দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরের হিসেব অনুযায়ী অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যত অক্ষর তত মাত্রা। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষর অপেক্ষা মাত্রা সংখ্যা বেশি। স্বরবৃত্ত ছন্দে অক্ষর অপেক্ষা মাত্রা সংখ্যা কম হয়।

পর্বের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে মূলত ২ থেকে ৫ পূর্ণ পর্বের মধ্যেই চরণ গঠিত হয়। আবার প্রতি চরণের পর্ব সংখ্যা সমান নাও হতে পারে। সাধারণত চরণের শেষ পর্বটি থাকে অপূর্ণ বা খন্ড। কখনো কখনো কোন চরণের শুরুতে একটি খন্ড পর্ব থাকতে পারে, যাকে বলা হয় অতিপর্ব।

ছন্দোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। সেগুলি হ’ল -

কবিতাটি প্রথমে পড়তে হবে থেমে থেমে। যাতে যথাস্থানে যতিচিহ্ন দেওয়া যায়। আসলে কবিতার ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবধানে যতি পড়ে। এই ব্যবধান মাত্রাগত অর্থাৎ সময়সীমা মেনে চলে। যেখানে জিহ্বার স্বাভাবিক বিরাম অর্থাৎ স্বাভাবিক উচ্চারণ বিরতি ঘটবে, সেখানেই যতিচিহ্ন (লম্বা দাঁড়ি) পড়বে। এই ভাবে শুরু থেকে অথবা এক যতিচিহ্ন থেকে আর এক যতিচিহ্ন পর্যন্ত হ’ল এক একটা পর্ব। একটি কবিতার প্রতিটি পূর্ণ পর্বই হবে সমান, যা কানের মাপে সমান, চোখের মাপে নয়। যতিচিহ্ন ঠিক জায়গায় না পড়লে কবিতাটি পড়া প্রায় খাপছাড়া হয়ে উঠবে। যেমন -

◡◡◡ ◡◡◡   ◡ ◡ ◡ ◡◡◡ ◡ ◡◡◡
ব সি য়া প্র ভা ত । কা লে সে তা রা র। দু র্গ ভা লে

এখানে ছয়মাত্রা বা ছয় অক্ষর পরপর যতিচিহ্ন দেওয়া হল, কিন্তু পড়তে গিয়ে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং স্বাভাবিক চলনে পড়া যাচ্ছে না। কানে লাগছে। কারণ সঠিক স্থানে যতিচিহ্ন পড়েনি। এবার সঠিক যতিচিহ্ন দিয়ে দেখা যাক -

◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡
ব সি য়া প্র ভা ত কা লে। সে তা রা র দু র্গ ভা লে

এবার অর্থও স্পষ্ট হ’ল। চলনও স্বাভাবিক রইল।

ছন্দ চেনার দুটো উপায় আছে। কবিতাটি প্রথমে পর্বভাগ করে নিয়ে প্রতিটি অক্ষরের মাথায় দল চিহ্ন ঠিক করে বসাতে হবে। তারপর কবিতার স্তবকটি কোন ছন্দে রচিত তা দেখতে হবে। এইটে বোঝবার জন্য দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। প্রথম পদ্ধতিটি হল - যথাস্থানে রুদ্ধদল মুক্তদল চিহ্ন দেওয়ার পর প্রত্যেকটি পর্বের ওপর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, কোথাও কোন পূর্ণ পর্বে মুক্তদল পাওয়া যাচ্ছে কিনা। অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ মুক্তদল পর্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মুক্তদল পর্বে যতগলো দল, ততগুলো মাত্রা হবে, কারণ প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দ ছাড়া অপর সব রকম ছন্দেই মুক্তদল একমাত্রার হয়। এবং অন্যপর্বগুলোর অক্ষর সংখ্যা গুণে দেখতে হবে। যদি দেখা যায়, কোন পর্বে মাত্রা সংখ্যার চেয়ে অক্ষর সংখ্যা কম আছে, তখন বুঝতে হবে, এর ছন্দ হবে মাত্রাবৃত্ত। কারণ ঐ পর্বে নিশ্চয়ই কোন না কোন রুদ্ধদল থাকবেই। আর ঐ রুদ্ধদলে দু’মাত্রা দিলেই পূর্বোক্ত দলের মাত্রাসংখ্যার সঙ্গে এটি সমান হবে। যদি দেখা যায়, সব পর্বেই অক্ষর সংখ্যা ঐ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুক্তদল পর্বের মাত্রাসংখ্যার সঙ্গে এটি সমান, তবে ধরে নিতে হবে ঐ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। শুধু পদান্তস্থিত রুদ্ধদলগুলোতে দু'মাত্রা দিলেই মাত্রা সংখ্যা সব সময় সমান হয়ে যাবে। আর যদি দেখা যায়, ঐ মুক্তদল পর্বে যতগুলো মাত্রা, অপর কোন পর্বের অক্ষর সংখ্যা ঐ মাত্রাসংখ্যার চেয়ে বেশি, ধরে নিতে হবে এটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতিই হ'ল, পর্বগুলি দল চিহ্নিত সবার আগে খেয়াল করতে হবে, এট স্বরবৃত্ত ছন্দ কিনা। স্বরবৃত্ত ছন্দ চেনার উপায় - এতে প্রতি পূর্ণ পর্বে ৪টি দল থাকে। প্রতি দলের মাত্রা ১ বে। আর যদি তা না হয় তা হললে দেখতে হবে এটি অক্ষর বৃত্ত ছন্দ কিনা। এতে প্রত্যেক পূর্ণ পর্বের অক্ষর সংখ্যা সমান হবে এবং ৪, ৬, ৮ এমন ওড় সংখ্যক হবে। এক্ষেত্রে পদান্ত ও একক রুদ্ধদল ২ মাত্রা পাবে। আর বাকী সব রুদ্ধদল ও মুক্তদল ১ মাত্রা পাবে। তাও যদি না হয় বাকী রইল মাত্রাবৃত্ত। সেই হিসাবে মাত্রা বসাতে হবে। সব মুক্তদল ১ মাত্রা এবং সব মুক্ত দল ১ মাত্রা। এরপর পর্বের মাত্রা সংখ্যা গুণে দেখতে হবে পর্বের মাত্রাসমতা বর্তমান আছে কিনা। যদি তা না থাকে, তাহলে প্রত্নমাত্রাবৃত্তও হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো দীর্ঘস্বরেও ২ মাত্রা দিয়ে মাত্রাসমতা আনতে হবে।

এবার প্রত্যেকটি ছন্দের একটি করে উদাহরণ দেওয়া যাক -

অক্ষরবৃত্ত :

১১১ ১২ ১১ ১১২ ১১
কহিলা এতেক সূর্য। ঝটিকার বেগে ৮ + ৬

১১২ ১১ ২ ১১১১১১
চারিদিক হতে দেব। ছুটিতে লাগিল ৮ + ৬

১১১১১১১১ ১২ ১১১
উত্থিত বালুকা যথা, । যখন মরুতে ৮+৬

১১১ ২ ১১ ১১১ ১১
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে। নৃত্য করি ফেরে। ৮+৬

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
22

এখানে কোন মুক্তদল পর্ব নেই, কিন্তু প্রতি পর্বের অক্ষর সংখ্যা ৮, অতএব প্রতি অক্ষরে একমাত্রা হিসেবে ৮ মাত্রা পাওয়া যায়। পদান্ত রুদ্ধদল ২ মাত্রা এবং পদের আদি ও মধ্যদল ১ মাত্রা এই হিসেবেও মাত্রা সমতা অর্থাৎ ৮ মাত্রাই পাওয়া যায়। ফলে এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

মাত্রাবৃত্ত :

১ ২ ১২ ১১১ ১২ ২ ২ ১১ ২
ভুতের মতন। চেহারা যেমন। নির্বোধ অতি। ঘোর

১ ১১ ১ ২ ২ ১১ ২ ২ ১ ১২ ২
যা কিছু হারায়। গিন্নি বলেন। কেষ্টা বেটাই। চোর।

এখানে কোন পর্বই শুধু মুক্তদল নয়, তাই পর্বের মোটমাত্রা সংখ্যা বোঝা গেল না। আবার পর্বে দলের সংখ্যা ৪ ও ৫, ফলে স্বরবৃত্তও নয়। বাকী থাকল অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত - অক্ষরবৃত্ত হলে প্রতি পর্বের অক্ষর সংখ্যা সমান হবে, কিন্তু এখানে কোন পর্বে ৫ অক্ষর, কোন পর্বে ৬ অক্ষর। ফলে অক্ষরবৃত্ত ও নয়। মাত্রাবৃত্তের হিসেবে প্রতি রুদ্ধদল ২ মাত্রার গণনা করলে পর্বমাত্রা সংখ্যা দাঁড়ায় ৬। অতএব এটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

স্বরবৃত্ত :

১ ১ ১১ ১১১ ১ ১১১১ ১১
জানি আমি। করকাঘাত। গ্রীষ্মদাহ। খর ৪+৪+৪+২

১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১ ১
শ্রাবণ ধারার। পীড়ন সওয়া। কঠিন বটে। বড়ো। ৪+৪+৪+২

এখানে প্রথম পর্বেই ৪টি মুক্তদল এবং প্রতি পূর্ণ পর্বে ৪টি দল। অতএব এটি স্বরবৃত্ত ছন্দের চিত। এর তিনটি চরণের প্রত্যেকটিতে তিনটি চতুর্মাত্রক পূর্ণ পর্ব ও ১টি দ্বিমাত্রক খন্ড পর্ব আছে।

ছন্দ-লিপিকরণ পদ্ধতি :

১ ১ ১১ ১ ১১১ ১১ ১ ১ ১১
সোনার জলে। দাগ পড়ে না, । খোলে না কেউ। পাতা ৪+৪+৪+২

১১১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১
অস্বাদিত। মধু যেমন। যুথী অনা। ঘ্রাতা ৪+৪+৪+২

১ ১ ১ ১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১
ভৃত্য নিত্য। ধূলা ঝাড়ে। যত্ন পুরা। মাত্রা ৪+৪+৪+২

১১ ১ ১ ১১ ১১ ১ ১ ১১ ১১
ওরে আমার। ছন্দোময়ী, । সেথায় করবি। যাত্রা ? ৪+৪+৪+২

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্তবক : চার চরণের স্তবক। সমিল।

চরণ : চার পর্বের চরণ। শেষটি অপূর্ণপদী।

পর্ব : পূর্ণ পর্ব চার মাত্রার। অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার।

মাত্রা : প্রতি চরণের মাত্রা বিন্যাস ৪+৪+৪+২

লয় : দ্রুত

রীতি : স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ।

পয়ার :

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আর একটি অতি প্রচলিত নাম 'পয়ারজাতীয় ছন্দ'। অনেকে একেই সোজাসুজি পয়ার বলেছেন। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রায় একমাত্র বাহন ছিল এই পয়ার। এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় - যে ছন্দোবন্ধের পংক্তি আটমাত্রা ও ছয় মাত্রার দুটি পর্ব নিয়ে গঠিত সাধারণ ভাবে তাকেই পয়ার বলা হয়।

পয়ারের বৈশিষ্ট্য :

(১) এর প্রতি চরণে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর সংখ্যা ১৪, মাত্রা ও ১৪। আট (৮) অক্ষরের পর যতি চিহ্ন পড়ে।

(২) সব মুক্তদল এবং আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদল একমাত্রার হয় এবং পদান্ত ও একক রুদ্ধদল দুই মাত্রার হয়।

(৩) এর লয় ধীর। তাই এ অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত শ্রেণীর।

(৪) এই ছন্দে স্বভাবমাত্রিক অক্ষর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দ ব্যবহারে কোন বাঁধা নেই। লঘু, গুরু, তৎসম, অর্ধতৎসম, লৌকিক সব ধরনের শব্দের ব্যবহার করা যায় এ ছন্দে।

(৫) এই ছন্দের যে কোন পর্বাঙ্গের পর ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া যায়, কিন্তু উপচ্ছেদ দেওয়া চলে না। এই ছন্দের শোষণ শক্তির কারণে সম্ভব হয়। প্রতি চরণের অষ্টম অক্ষরে অর্ধযতি ও চতুর্দশ অক্ষরে পূর্ণযতি হয়।

(৬) প্রাচীন পয়ারে ভাবযতি ও ছন্দ-যতি একই জায়গায় পড়েছে। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে তা আর এক স্থানে পড়েনি।

পয়ারের শোষণ শক্তি :

পয়ারের শোষণশক্তির প্রতি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। এর অন্য নাম দেওয়া যায় 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্থিতিস্থাপকতা গুণ'। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের

একটা বিশেষ তান আছে বলেই তাকে 'তানপ্রধান ছন্দ' বলা হয়। এই বিশেষ তানের জন্যই এর মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়, এর বুনট ঘনসংবদ্ধ নয়। তাই এর ফাঁকে ফাঁকে অনায়াসে অনেক ধ্বনি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এর স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্য এর মাত্রাবৃদ্ধি হয় না। একেই বলে পয়ারের শোষণশক্তি। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে তাতে মোট অক্ষর সংখ্যা এক রেখে ক্রমাগত হলন্ত অক্ষর যুক্ত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে পয়ার ছন্দের ঐ বিশেষ শক্তির গুণেই এখানে ছন্দোপতন ঘটেনি, -

১ ২ ১১১ ২ ১ ২ ১১১
ক. পাষাণ মিলায়ে যায়। গায়ের বাতাসে ৮+৬

১ ২ ১১১ ২ ১ ২ ১১১
খ. পাষাণ মূর্ছিয়া যায়। গায়ের বাতাসে ৮+৬

১ ২ ১১১ ২ ১ ২ ১১১
গ. পাষাণ মূর্ছিয়া যায়। অঙ্গের বাতাসে ৮+৬

১ ২ ১১১ ২ ১ ২ ১১১
ঘ. পাষাণ মূর্ছিয়া যায়। অঙ্গের উচ্ছাসে ৮+৬

এই চরণে নানা হলন্ত অক্ষর ও যুক্তাক্ষর যুক্ত করলেও ছন্দের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ৮+৬ মাত্রার তাল ঠিকই থাকে।

পয়ারের রূপভেদ :

পয়ারের প্রধান রূপ দুটি - পয়ার ও মহাপয়ার।

চোদ্দ অক্ষর বা মাত্রার পংক্তি বা চরণকে পয়ার এবং তার অধিক মাত্রার চরণ বিশিষ্ট পয়ারকে মহাপয়ার বলে।

পয়ারের দুটো ভাগ - সমিল পয়ার এবং অমিল পয়ার।

সামিল পয়ার :

এই পয়ারে চরণের শেষে ছন্দমিল থাকে। একে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল -

(১) লঘু দ্বিপদী বা দ্বিপদী পয়ার :

যে পয়ার ছন্দের প্রতি চরণে দুটি মাত্র পর্ব থাকে, প্রথম পর্ব ৮ মাত্রার এবং দ্বিতীয় পর্ব ৬ মাত্রার দ্বারা গঠিত হয় এবং মোট চরণের মাত্রা থাকে ১৪। তাকে বলে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

লঘু দ্বিপদী পয়ার ছন্দ। পরপর দুটি চরণে অন্ত্যমিলও এই ছন্দের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যেমন -

১১১১১ ১১১১১ ১১ ১১১১১
ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি। সদা ব্যঙ্গ করে ৮+৬

১১ ১১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ধ্বনি কাছে ঋনী সে যে। পাছে ধরা পড়ে ৮+৬

(২) তরল পয়ার :

এই ধরণের পয়ারে প্রতি পংক্তিতে ১৪ অক্ষর থাকে। এই চরণে মিল থাকে। চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে আলাদা মিল থাকে। আধুনিক সাহিত্য এই রকম পয়ারের প্রায় প্রয়োগ নেই বললেই চলে। একটি উদাহরণ -

১১১১১ ১১১১১ ১১১১১১১
দেখ দ্বিজ মনসিজ। জিনিয়া মূরতি ৮+৬

১১১১১১১১১১ ১১১১১ ১১
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র। পরশ্রয়ে শ্রুতি ।।

(৩) ভঙ্গ পয়ার :

এই পয়ারের প্রথম চরণে ষোল অক্ষর এবং দ্বিতীয় চরণে চৌদ্দ অক্ষর থাকে। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল প্রথম পংক্তির দুটি পর্ব আসলে একটি পর্বের দ্বিতীয়বার উচ্চারণ। কখনো তা তৃতীয় পংক্তিতে উচ্চারিত হয়। যেমন -

১১১১১ ২ ২ ১১১১১ ২ ২
বিদ্যাপতি মোর নাম। বিদ্যাপতি মোর নাম। ৮+৮

১১২ ১১ ১১ ১১২ ২
বিদ্যাধর জাতি বাড়ি। বিদ্যাধর গ্রাম ।। ৮+৬

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
26

(৪) মালঝাঁপ পয়ার :

যে পয়ারে দুই চরণের অন্ত্যে মিল থাকে তার ওপর প্রতি চার অক্ষরের অন্ত্যেও বিন্যাস লক্ষিত হয় অর্থাৎ চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ অক্ষরেও মিল লক্ষিত হয়, তাকে বলে মালঝাঁপ পয়ার।

যেমন -

১১ ২ ১১ ২ ১১ ২ ১ ১
কতোয়াল। যেন কাল। খাঁড়া ঢাল। ঝাঁকে

১১ ২ ১১ ২ ২ ২ ১ ১
ধরি বান। খরশান। হান হান। হাঁকে।

(৫) পর্যায়সম পয়ার :

এই পয়ারে প্রথম পংক্তির এবং দ্বিতীয় পংক্তির সঙ্গে চতুর্থ পংক্তির অন্ত্যমিল ঘটে। যেমন -

তোমার ছাপানো। শাড়িতে মাছের ঝাঁক

স্মৃতির লবণ। সমুদ্রে তোলে মুখ,

মৌসুমী - হাওয়া। হয়ে আছে নির্বাক

যেন নাবিকের। পেশল তপ্ত বুক।

(৬) মধ্যমিল পয়ার :

এখানে প্রথম ও চতুর্থ চরণে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল লক্ষ্য করা যায়।

এসো ছেড়ে এসো কলি। কুসুম শয়ন

বাজুক কঠিন মাটি। চরণের তলে

কত আর করি গো। বসিয়া বিরলে ,

টিপ্পনী

আকাশ কুসুম বনে। স্বপন চয়ন।

(৭) প্রবহমান পয়ার :

এই ধরনের পয়ারের মূল বৈশিষ্ট্য হল, ভাবযতি ও ছন্দোযতি একস্থানে পড়ে না। যেমন -

টিপ্পনী

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে। একেলা বসিয়া

পড়িতেছে মেঘদূত ;। গৃহত্যাগী মন

মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে। লয়েছে আসন,

উড়িয়াছে দেশদেশান্। তরে কোথা আছে

অমিল পয়ার :

এই পয়ার ছন্দের চরণের শেষে মিল থাকে না। প্রকৃতঅর্থে অমিত্রাক্ষর ছন্দই হ'ল অমিল পয়ার। এর কোন রূপভেদ নেই।

দূরে গেল জটাজুট। কমন্ডলু দূরে

রাজরথী - বেশে মূঢ়। আমায় তুলিল

স্বর্ণরথে। কহিল যে। কত দুষ্টমতি।

কভু রোষে গর্জ্জি, কভু। সুমধুর স্বরে,

স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি। মরিতে, সরমা !

মহাপয়ার বা দীর্ঘপয়ার :

আধুনিক কালে পয়ারের যে দীর্ঘরূপ প্রচলিত হয়েছে অর্থাৎ ১৮ মাত্রা কিম্বা তার কিছু বেশি মাত্রা চরণ গঠিত। এই ১৮ মাত্রার সমিল দ্বিপদী পংক্তির ৮ মাত্রার পর অর্ধযতি ও পরবর্তী ১০ মাত্রার পর পূর্ণযতি সূচিত রূপকে মহাপয়ার বা দীর্ঘপয়ার বা বড় পয়ার বলা হয়। এই মহাপয়ার দুই প্রকারের - সমিল মহাপয়ার ও অমিল মহাপয়ার।

টিপ্পনী

সমিল মহাপয়ার :

চরণের অন্ত্যমিল থাকে বলে এই ধরনের পয়ারকে বলে সমিল মহাপয়ার। যেমন -

১ ১ ১১১ ১ ২   ১ ১ ২   ১১ ১১১১
সত্য মূল্য না দিয়েই। সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি,   ৮ +১০

১ ১ ২ ১ ১   ২ ১ ২   ১ ১ ২   ২ ১১
ভালো নয় ভালো নয়। নকল সে সৌখিন মজদুরি।   ৮+১০

সমিল মহাপয়ারের আবার পর্যায়সম ও মধ্যমিল প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

অমিল মহাপয়ার :

এতে ৮+১০ অর্থাৎ ১৮ মাত্রার দুই পর্বের চরণ থাকে কিন্তু অন্ত্যমিল থাকে না। যেমন -

১১ ২ ১১১১   ১১ ২   ১১১ ১ ২
দেখিলাম অবসন্ন। চেতনার গোধুলি বেলায়   ৮+১০

১১ ২ ১১ ২   ১ ১ ১১ ২   ২ ১১
দেহ মোর ভেসে যায়। কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি   ৮+১০

১১ ১১১১১১   ১১ ২ ১১১ ১১১
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ,। নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,   ৮+১০

১১১১ ১ ১ ১১   ১১ ২ ১ ২ ১ ২
চিত্র করা আচ্ছাদনে। আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,   ৮+১০

১১ ২ ১১১১
নিয়ে তার বাঁশিখানি।   ৮+ .....

টিপ্পনী

অমিত্রাক্ষর ছন্দ :

বাংলা ছন্দোমুক্তির ক্ষেত্রে শ্রীমধুসূদন দত্তের কৃতিত্ব সর্বাধিক। তবে বাংলা ছন্দের মুক্তির ক্ষেত্রে মধুসূদন প্রভাবিত হয়েছিলেন ফরাসি কাব্যসাহিত্যের 'Verselibre' এবং ইংরেজি কাব্যের মিলটনের 'Blank verse' থেকে। একই সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের অন্ত্যানুপ্রাসহীনতা, ধ্বনিগাম্ভীর্য ও শব্দৈশ্বর্যের দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হন। এরই ফলশ্রুতিতে মধুসূদন আবিষ্কার করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

পয়ার ছিল নির্দিষ্ট অক্ষরে (১৪) সীমাবদ্ধ, অন্ত্যমিল যুক্ত। কাজেই সেখানে ছন্দোমুক্তি ঘটছিল না। মধুসূদনই প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করলেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'তে আর তার সার্থক প্রকাশ ঘটল 'মেঘনাদবধ কাব্য' তে। বাংলা যুক্তবর্ণের ধ্বনিরহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বর ও ব্যঞ্জনের যৌথ সমন্বয়ে এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টি করলেন। বাংলা কবিতার এক বিপুল সম্ভাবনা সূচিত হ'ল অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য মিলহীনতা নয় ; ভাবের প্রবহমানতা। তাই অনেকে এই ছন্দকে বলেছেন প্রবহমান অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল -

(১) পয়ারের অন্ত্যমিলল বা অন্ত্যনুপ্রাস বর্জন।

(২) ভাবকে চরণ থেকে চরণান্তরে প্রবাহিত করে ভাবের প্রবহমানতা আনা।

(৩) চরণের মধ্যে বিভিন্ন ধ্বনি সমবায়ে ছন্দোস্পন্দ সৃষ্টি করে অন্ত্যমিল বর্জনের ক্ষতি পূরণ করা।

(৪) এতে সুরের আতিশয্য নেই।

(৫) চৌদ্দ মাত্রার পয়ারের কাঠামোয় এই ছন্দ সৃষ্টি।

(৬) পয়ারের রীতি (৮+৬) অনুসারে এখানে পর্ব বিভাগ করা হয়। পূর্ণযতির কাঠামো সর্বদা সঠিক ও সমান থাকে।

(৭) স্তবক বন্ধনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই এই ছন্দে।

(৮) যতি স্থাপনের অবাধ স্বাধীনতা এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে ছন্দোযতি বা ভাবযতি বা অর্থযতি একস্থানে পড়ে না। যেখানে বক্তব্য সমাপ্ত হয়েছে সেখানেই পড়েছে ভাবযতির সঙ্গে ছন্দোযতি।

তবে মধুসূদন তাঁর নবপ্রবর্তিত ছন্দের নামকরণ অমিত্রাক্ষর করেছিলেন কিনা সে বিষবে নানা মত আছে। তিনি নিজে এই নাম ব্যবহার করেছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। শুরুতে এই ছন্দকে Blank verse- ই বলা হত। সম্ভবত,

প্রচলিত বাংলা পয়ার ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য অর্থাৎ মিলের অভাব বা মিত্রাক্ষরের অভাবের জন্যই এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। 'কবিতার চরণ হইতে মিত্রাক্ষর রূপ শৃঙ্খল মোচনই মধুসূদন প্রবর্তিত এই নূতন ছন্দের প্রকৃতি - মধুসূদন প্রদর্শিত এই সূত্রানুসারেই অচিরকালের মধ্যে ইহার নূতন নামকরণ হইল অমিত্রাক্ষর ছন্দ।' রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' - এর ষষ্ঠ পর্বে ৬৮ তম খন্ডে ১৭৮২ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর লেখায় প্রথম অমিত্রাক্ষর শব্দের প্রয়োগ করেন। এই হিসেবে বলা যায়, দ্বারকানাথই সম্ভবত অমিত্রাক্ষর শব্দটি ব্যবহার করেন।

টিপ্পনী

মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ অমিল অমিত্রাক্ষর। যার চরণের শেষে মিল নেই। কিন্তু পরবর্তী বাংলা কবিতায় দুই প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হ'ল - সমিল অমিত্রাক্ষর ও অমিল অমিত্রাক্ষর।

সমিল অমিত্রাক্ষর:

এই ছন্দে এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের অন্ত্যমিল লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কালের অনেক কবি এই ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। উদাহরণ -

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে একদেহ -
তখন কী জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?

মধুসূদন পয়ারের কাঠামোর (৮+৬) ওপর তাঁর অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কবিরা মহাপয়ারের কাঠামোতেই অমিত্রাক্ষর স্থাপন করেছন। বাংলা ছন্দে আরো বৈচিত্র্য এসেছে এতে। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক -

১১ ২ ১১১ ১ ১ ১১১ ১ ২ ১ ২
শুধু তাই পবিত্র, যা। ব্যক্তিগত গভীর সন্ধ্যায় ৮+১০

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নরম আচ্ছন্ন আলো;। হলদে ম্লান বইয়ের পাতার ৮+১০

১ ১ ১ ১১১১১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২
লুকানো নক্ষত্র ঘিরে। আকাশের মতো অন্ধকার ; ৮+১০

১১১ ১ ২ ১১ ১১১ ১ ১ ২ ১ ২
অথবা অত্বর চিঠি। মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায় .... ৮+১০

অমিল অমিত্রাক্ষর :

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি চরণের সঙ্গে অন্য চরণের অন্ত্যানুপ্রাসজনিত কোন মিল থাকে না। মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর হ'ল এই অমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দ। একটি উদাহরণ -

১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বিধির ইচ্ছায়, বাছা। হরিছে গো তোরে ৮+৬

১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু। সবংশে মজিবে ৮+৬

১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
অধম ! এ ভার আমি। সহিতে না পারি ৮+৬

১১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ধরিনু গো গর্ভে তোরে। লঙ্কা বিনাশিতে ! ৮+৬

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দ। এই ছন্দ ধ্রুপদী কাব্যরীতির আদর্শ। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান পয়ার সমিল প্রবহমান পয়ারে পরিণত হয়েছে।আরো পরে এ ছন্দ রোমান্টিক কাব্যেরও বাহন হয়েছে। এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য হল, মিত্রাক্ষরহীনতা বা ভাবযতি স্থাপনের স্বাধীনতা। তাছাড়া মধুসূদন কর্তৃক নামধাতুর ব্যবহার, সংযত অনুপ্রাস ব্যবহারে কাব্যোৎকর্ষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা, ধীরোদাত্ত এবং কোমল মধুর ভাবানুযায়ী শব্দ প্রবোগে সংগীতের মূচ্ছর্না সৃষ্টির সফল চেষ্টা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ গৌরব ও অনুপম ঐশ্বর্য।

মুক্তক বা মুক্তবন্ধ বা বলাকার ছন্দ :

'বলাকার ছন্দ' নামে পরিচিত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত ছন্দই হ'ল মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ একে 'বেড়াভাঙা পয়ার' বলেছেন। এই ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই একটি রূপ। এই বলাকার ছন্দের পূর্বরূপ দেখা যায় 'মানসী'র কবিতায়। বিশেষত 'নিষ্ফল কামনা'য়। এখানে তিনি অপূর্ণ পর্বের মাত্রার ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু এখানেই কবি অপূর্ণ পর্বের সহায়তায় পৃথক একটি পদ

রচনার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। যেমন -

১১১১ ২
বৃথা এ ক্রন্দন ৬

১১ ১ ১২ ১১ ১১১১১১
বৃথা এ অনল ভরা / দুরন্তবাসনা ৮+৬

১১ ১১ ২
রবি অস্ত যায় ৮+৬

১১১১ ১১২ ১ ১ ১ ১ ১১
অরণ্যেতে অন্ধকার / আকাশেতে আলো ৬

এখানে পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার। আবার ৬ মাত্রার পর্বও পদ গঠন করেছে আলাদা ভাবে। চরণের শেষে মিলও নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'মানসী' তে 'বলাকার' ছন্দের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এর বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যগরন্থ রচনা করেন। সেখানে মুক্তকের ব্যবহার দেখা যায়। এই ছন্দ আসলে কি ? এর সংজ্ঞায় বলা যায় -

> "পংক্তির পর পংক্তিতে বাধাহীন ভাবের প্রবহমানতা বিশিষ্ট অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিসজ্জায় সজ্জিত অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত যে ছন্দোবন্ধ থাকে তাকে বলা যায়মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দ।"

বস্তুত অসম চরণ বিন্যাসই বলাকার ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেগুলো সমিলও হতে পারে, অমিলও হতে পারে। যেমন -

ওরে দেখ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে - অকূল আলোতে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া এই স্তবকে অসম চরণ রয়েছে, আবার মিলও রয়েছে।

এর বৈশিষ্ট্যগুলি এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

(১) অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত ভাবযতি ও ছন্দোযতির সহাবস্থান ঘুচিয়ে এ ছন্দ ভাবকে অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুবিধা করে দেয়। প্রবহমানতাই এর প্রধান ধর্ম। যেমন -

ওই যে সূদূর নীহারিকা	১০
যারা করে আছে ভিড়	৮
আকাশের নীড়;	৬
ওই যারা দিনরাত্রি	৮
আলো হাতে চলিয়াছে / আধারের যাত্রী	৮+৬
গ্রহ তারা রবি	৬
তুমি কি তাদেরি মত / সত্য	৮+৪

এখানে বোঝাই যাচ্ছে ভাবের মুক্তি ঘটেছে। ছন্দের বন্ধনে তা বদ্ধ থাকেনি।

(২) এই ছন্দে অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তি থাকে। ২ মাত্রার পর্ব বিশিষ্ট পংক্তি থেকে ২২ মাত্রার পংক্তি দেখা যায়। যেমন -

তোমার চিকণ	৬
চিকুরের ছায়াখানি / বিশ্ব হতে যদি মিলাইত	৮+১০
তবে	২
একদিন কবে	৬
চঞ্চল পবনে লীলায়িত	১০
মর্মর - মুখর ছায়া / মাধবী - বনের	৮+৬
হত স্বপনের	৬

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
34

(৩) মুক্তকে স্তবক বন্ধনের কোন নির্দি°ত নিয়ম নেই। তাই এতে ৪ পংক্তির স্তবক যেমন আছে তেমনি ৩৬ পংক্তি কিম্বা তার চেয়ে বেশি পংক্তির স্তবকও আছে।

(৪) এই ছন্দে চলিত শব্দ ও ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন -

খসল বেড়ি হাতে পায়ে ;

এই যে এবার

দেবার নেবার

পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এখানে 'খোলসা', 'ডাইনে বাঁয়ে' প্রভৃতি চলিত শব্দ এবং 'খসল' চলিত ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

তবে এই মুক্তক ছন্দ নানা রকমের হতে পারে - দলবৃত্ত সামিল মুক্তক ছোট পয়ার, দলবৃত্ত অমিল মুক্তক ছোট পয়ার, মিশ্রবৃত্ত অমিল মুক্তক ছোট পয়ার, মিশ্রবৃত্ত সমিল মুক্তক ছোট পয়ার, মুক্তক বড় পয়ার, কলাবৃত্ত সমিল মুক্তক বড় পয়ার ইত্যাদি।

তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেন নি। সম্ভবত বাংলায় মধুসূদনই 'পদ্মাবতী' নাটকে এই মুক্তকের ব্যবহার করেন। অনেকে একে 'ভাঙা' অমিত্রাক্ষর' বলেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র (১৮৬১) উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন -

"হে সজ্জন,

স্বভাবের সুনির্মল পটে,

রহস্য রঙ্গের রঙ্গে,

চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে।"

এই রচনাকেই মুক্তকের আদি নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর বহু নাটকেই এ ধরনের মুক্তক ব্যবহার করেন।যেমন -

ওঠ, ওঠ, / জীবন সঙ্গিনী	৪+৬
ওঠ সন্ন্যাসিনী।	৬
মায়ামোহ / কর পরিহার	৪+৬
জাগাইয়া পূর্বস্মৃতি / করহ স্মরণ	৭+৬
কতবার করিয়াছি / জনম গ্রহণ।	৮+৬
জন্মমৃত্যু / ঘুচেছে এবার	৪+৬
একাকার / একাধার / নির্বাণ আগারে	৪+৪+৬
জন্মমৃত্যু ফুরাইল।	৮
কেন খেদ কর আর ?	৮

এতো সাধারণ মুক্তকেরই মতো। কোন পার্থক্য নেই মুক্তকের সাথে। এগুলো অক্ষরবৃত্ত চন্দেই রচিত। পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪, ৬, ৮ অর্থাৎ যুগ্মাক্ষর ও যুগ্মমাত্রিক। এ জাতীয় ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' নামেই পরিচিত।

প্রশ্নাবলী :

১. সাধারণ পরিচয় দাও : দল, অক্ষর, কলা বা মাত্রা, ছেদ, যতি, পর্ব - পর্বাঙ্গ, লয়, চরণ, স্তবক

২. অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য লেখো। এই ছন্দের একটি উদাহরণ দাও।

৩. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। এর একটি উদাহরণ দাও।

৪. স্বরবৃত্ত ছন্দ আর কি কি নামে পরিচিত? এর সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য লেখো। উদাহরণ দাও।

৫. পয়ার সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৬. অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি? এর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

৭. মুক্তক ছন্দের পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় একক

বাংলা অলংকার

বাংলা অলংকার :

টিপ্পনী

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অলংকার শব্দের দুটি অর্থ। একটি হল সৌন্দর্য। অন্যটি, যা ভূষিত করে, সুন্দর করে, শোভা বর্ধণ করে ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় অর্থেই অলংকার শব্দটির ব্যবহার। মানব-মানবীকে সুন্দর করে বলে হার, চুরি, কঙ্কণ, কেয়ূর ইত্যাদির নাম অলংকার। কোন বিশেষ ব্যক্তি কোন সভায় এলে বলা হয় তিনি সভা বা আসন অলঙ্কৃত করলেন। আবার মধুসূদন বলেছেন কৃত্তিবাস সম্পর্কে 'এ বঙ্গের অলংকার'। এ সব ক্ষেত্রেই ভূষণ, সৌন্দর্য, শোভা অর্থেই অলংকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও সুন্দর করে সেজে উঠতে পারে। তাকে বিশেষ যত্ন নিয়ে সাজাতে হয়। কখনো তা শব্দের বারংবার ব্যবহারে সুন্দর হয়। কখনো বা অর্থের মাধুর্য্যে সুন্দর হয়। আর তখনি তা অলংকারে ভূষিত হয়। ভাষা ও সাহিত্যের অলংকারের নানা ভাগ ও নাম। যেমন - অনুপ্রাসণ, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি।

অলংকার শব্দ সাধারণত ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত। যা অন্য কোনো কিছুকে সুন্দর করে বা ভূষিত করে বা সজ্জিত করে, এমন উপাদানকে বলা হয় অলংকার। কিন্তু, কাব্যের বা ভাষার ক্ষেত্রে অলংকার কিছুটা ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের উপাদান ভাষিক। অর্থাৎ ভাষার বিশেষ ধরনের ব্যবহারেই গড়ে ওঠে ভাষার সৌন্দর্য,তার ভূষণ। যার ফলে ভাষা হয় শ্রুতিমধুর, মনোহারী। সাধারণ হয়নে ওঠে অসাধারণ। কাজেই অলংকারের সংজ্ঞা দেওয়া যায়, এইভাবে -

> "যে ভাষিক উপাদান বাক্যের ধ্বনি বা অর্থকে কিংবা উভয়কেই চারুত্ব দেয়, অর্থাৎ বাক্যকে সজ্জিত, ভূষিত, সৌন্দর্যমন্ডিত করে তাকে মনোহরারি করে তোলে, তাকে অলংকার বলে।"

অলংকারের শ্রেনীবিভাগ :

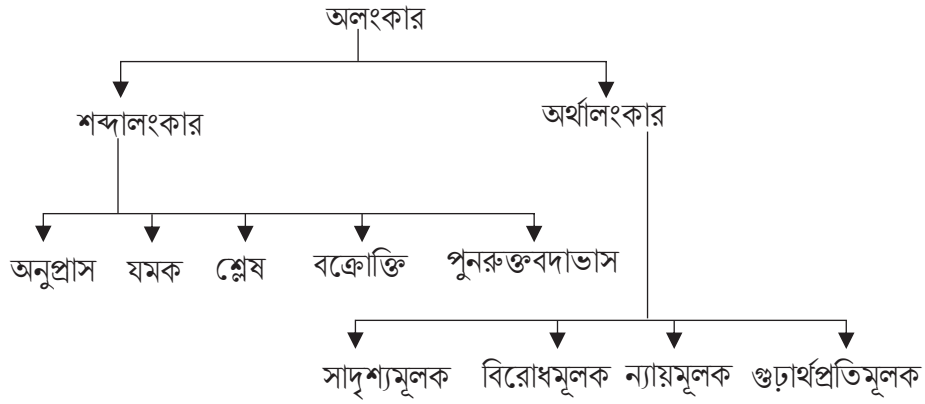

টিপ্পনী

শব্দালংকার:

যে অলংকার ধ্বনির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং যা শ্রুতিসৌকর্যবিধায়ক তাকেই বলা হয় 'শব্দালংকার'। এই অলংকার ধ্বনি নির্ভর বলে ধ্বনি পরিবর্তন করে দিলে অলংকার নষ্ট হয়ে যায়। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি এই অলংকারের দৃষ্টান্ত।

অনুপ্রাস :

একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে কিংবা একজাতীয় একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাসে শ্রুতিমাধুর্য্য সৃষ্টি হলে তাকে অনুপ্রাস অলংকার বলে। যেমন -

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ - গোবিন্দ দাস , এই উদাহরণে 'ন' এবং 'ন্দ' ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ বার বার উচ্চারিত হয়ে শ্রুতিমাধুর্য্য সৃষ্টি করেছে। এটাই অনুপ্রাস।

অনুপ্রাস শব্দের আক্ষরিক ও পারিভাষিক অর্থ একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে। শব্দটির বূৎপত্তি হল :

অনু - প্র + অস্ + অ (ঘঞ্)।

'অনু' উপসর্গটির অর্থ পশ্চাৎ, আর 'প্রাস' শব্দের অর্থ বিন্যাস বা আবৃত্তি। অর্থাৎ একটি ধ্বনির পরে পরে সেই একই ধ্বনির বিন্যাস এই হল অনুপ্রাসের আক্ষরিক অর্থ। তবে মনে রাখতে হবে, ধ্বনি বা বর্ণ লতে ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণকেই বোঝানো হয়।

শব্দালংকারগুলিকে মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল - অনুপ্রাস। কেননা প্রাচীন বা আধুনিক - সব ধরনের কবিতায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অলংকার হ'ল অনুপ্রাস। এমন কি গদ্যে ও প্রাত্যহিক কথাবার্তায়ও অনুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

অনুপ্রাসের শ্রেনীবিভাগ :

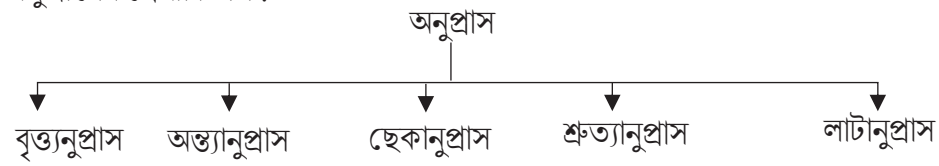

বৃত্ত্যানুপ্রাস :

যদি কোনো একটি ব্যঞ্জনধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা কোনো ব্যঞ্জন ধবনিগুচ্ছ একই ক্রমে বুবার ধ্বনিত হয়ে শ্রুতিমাধুর্য্য সৃষ্টি করে তবে তাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলে। যেমন -

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। - জীবনানন্দ

এই উদাহরণে 'আর আর আর' এই ধ্বনিগুচ্ছের বার বার ফিরে ফিরে আসা আছে। (তার >আর, কবেকার >আর, অন্ধকার >আর, বিদিশার >আর)। এই জন্য এটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

'বৃত্ত্যনুপ্রাস' শব্দটির মূলে রয়েছে 'বৃত্তি' শব্দটি। বৃত্তি + অনুপ্রাস = বৃত্ত্যনুপ্রাস। 'বৃত্তি' শব্দটি এসেছে 'বৃৎ' ধাতু থেকে, যার অর্থ বার বার ফিরে ফিরে আসা। কাজেই আপাতভাবে বৃত্ত্যনুপ্রাস অনুপ্রাসেরই নামান্তর। তাই বলা যায় সব অনুপ্রাসই আসলে বৃত্ত্যনুপ্রাস। কারণ অনুপ্রাস হ'ল ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্তি (আবৃত্তি)। যখন ব্যঞ্জনধ্বনি দু'বার অথবা তার চেয়ে বেশি বার আবৃত্ত হয়, তখন তা অনুপ্রাস হয়। সেদিক থেকে বলা যায়, সব অনুপ্রাসই বৃত্ত্যনুপ্রাস।

টিপ্পনী

অন্ত্যানুপ্রাস :

পদ্যের এক চরণের সঙ্গে অন্যচরণের কিংবা এক পদ বা পর্বের সঙ্গে অন্য পদ বা পর্বের অন্তিম ধ্বনিসাম্যকে বলে অন্ত্যানুপ্রাস। যেমন -

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।

গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।।

এখানে চরণের অন্ত্যে মিলতো আছেই (ভূমি ও তুমি) আবার পর্বে পর্বেও মিল আছে। যেমন - 'নমঃ', 'মম' এবং 'তীর', 'সমীর '- এর মধ্যে মিল।

ছেকানুপ্রাস :

দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্তভাবে যদি একই ক্রমে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হয়, তবে তাকে ছেকানুপ্রাস বলে। যেমন -

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গমোর,

এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা। - রবীন্দ্রনাথ।

এখানে 'ন্ধ' ধ্বনিগুচ্ছ সংযুক্তভাবে একই ক্রমে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হয়েছে। তাই এটি ছেকনুপ্রাস হয়েছে। 'ছেক' শব্দের অর্থ দুই। কাজেই ধ্বনিগুচ্ছের দু'বার উচ্চারণই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাসের মধ্যে পার্থক্য :

(১) একক ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়, ছেকানুপ্রাস হল ধবনিগুচ্ছের আবর্তন।

(২) ছেকানুপ্রাসে ধবনিগুচ্ছ সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়ে। বৃত্ত্যনুপ্রাসে ধ্বনিগুচ্ছ বহুবার উচ্চারিত বা ধ্বনিত হবে।

টিপ্পনী

(৩) ছেকানুপ্রাসে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছকে উচ্চারিত হতে হবে একই ক্রমে। কিন্তু বৃত্ত্যনুপ্রাসে ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছ বিপরীত ক্রমেও উচ্চারিত হতে পারে।

শ্রুত্যনুপ্রাস :

বাক্‌যন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশকে বলে শ্রুত্যনুপ্রাস। যেমন -

(ক) বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি। - রবীন্দ্রনাথ

- এখানে 'ব্', 'ব্', 'প্', 'ভ', 'ব্' ও 'ম' - এই ধ্বনিগুলি ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন। অর্থাৎ উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণের ফলে শ্রুতিমধুর সমাবেশ ঘটেছে। তাই শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে এখানে।

(খ) ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি, প্রিয়ে - রবীন্দ্রনাথ।

- এখানে 'ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত' অংশে 'দ', 'ধ', 'থ' ও 'ত' ধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান দন্ত। এগুলো তাই দন্ত্যব্যঞ্জন। এরা শ্রুতিমাধুর্য তৈরী করেছে বলে এই অলংকার শ্রুত্যনুপ্রাস।

লাটানুপ্রাস :

'লাট' শব্দের অর্থ 'সুরসিক'। তাই লাটানুপ্রাস সুরসিক পাঠকের হৃদকেই রঞ্জিত করতে সক্ষম। এর সংজ্ঞায় বলা যায় -

একটি শব্দ যদি একই অর্থে কেবল তাৎপর্যমাত্রের ভেদে একাধিকবার ব্যবহৃত হয় তবে তাকে লাটানুপ্রাস বলে। যেমন -

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি

পরান ভরি উঠে শোভাতে। - রবীন্দ্রনাথ।

এখানে 'পরান' ও 'ভরি' শব্দদুটি দুবার উচ্চারিত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে এদের অর্থ এক থাকলেও তাৎপর্যের একটু পার্থক্য আছে। প্রথম 'পরান' শব্দ কর্মপদ, দ্বিতীয় 'পরান' শব্দ কর্তৃপদ (কর্ম কর্তৃপদ প্রাপ্ত)। প্রথম 'ভরি' কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া, দ্বিতীয় ভরি কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া। তাই এটা লাটানুপ্রাসের উদাহরণ। বাংলায় আমরা নিত্যদিনকার ব্যবহারের ভাষায় এই অলংকার ব্যবহার করি। সাহিত্যেও এর ব্যবহার আছে। যেমন -

(ক) দেখ, টাকা, টাকা। তার আবার ছেঁড়া ফাটা !

(খ) আজ বাড়িতে সবাই এসেছে। বাড়িটাকে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

(গ) আজু মঝু দেহ দেহ করি মানলুঁ

আজু মঝু গেহ ভেল গেহা। - বিদ্যাপতি।

তবে এ কথা ঠিক, বাংলা সাহিত্যে এই অলংকারের ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না।

যমক :

একই শব্দ বা একই রকম উচ্চার্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার উচ্চারিত হলে তাকে যমক অলংকার বলে। যেমন -

কেবল আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হ'ল - রামপ্রসাদ সেন।

এখানে একই রকম উচ্চার্য শব্দ 'আসা' ও 'আশা'র আলাদা অর্থ। 'আসা'র অর্থ আগমন এবং 'আশা'র অর্থ আকাঙ্ক্ষা। আবার -

কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,

এ বঙ্গের অলংকার ! - মধুসূদন।

এই উদাহরণে 'কীর্তিবাস' শব্দের অর্থ - কবি কৃত্তিবাস ওঝা । দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' শব্দের অর্থ কীর্তিতে বসতি যাঁর। একই শব্দ 'কীর্তিবাস' এর দু'বার দুই অর্থে ব্যবহারের কারণে এখানে যমক অলংকার হয়েছে। এছাড়া -

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে। - ঈশ্বরগুপ্ত

এখানে প্রথম কান্তার হল বনভূমি, আমোদ হল সৌরভ, কান্ত অর্থে বসন্তকাল এবং সহকারে মানে সমাগমে। আর দ্বিতীয় চরণে কান্তার = দয়িতার, আমোদ = আনন্দ, কান্ত = প্রিয় ব্যক্তি, সহকারে = সঙ্গে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এখানে দুই চরণের প্রতিটি শব্দ দুবার করে দুই রকম অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তাই এখানে যমক অলংকার হয়েছে।

আসলে 'যমক' শব্দের অর্থ হল জোড়া। অর্থাৎ একই রকম দুই বস্তু যমক। ভাষার ক্ষেত্রে সমোচ্চারিত বিভিন্ন শব্দের সন্নিবেশকে যমক বলে।

এই যমক চার প্রকারের হয়। আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক এবং সর্ব যমক। এই শ্রেনীবিন্যাস মূলত সমোচ্চারিত শব্দগুলির অবস্থান অনুসারে।

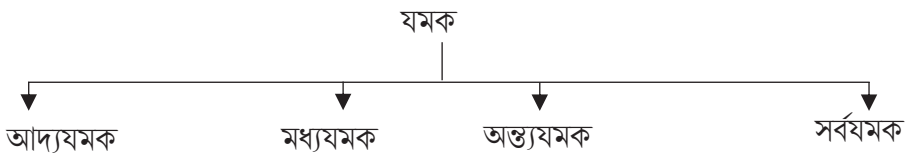

আদ্য যমক :

চরণের আদিতে বা শুরুতে যে যমক হয়, তাকে বলে আদ্য যমক। যেমন -

ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এখানে চরণের শুরুতে 'ভারত' শব্দটি দুটি অর্থে (প্রথম ভারত - ভারতচন্দ্র এবং দ্বিতীয় ভারত - ভারতবর্ষ) ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটি আদ্য যমক। আবার -

কমলাসনে কমলাসনে কমলাপতি বিহর।

প্রথম কমলাসনে - কমল আসনে, দ্বিতীয় কমলাসনে - কমলার সনে। এটিও আদ্য যমক।

মধ্য যমক :

চরণের মাঝে যমক হলে হয় মধ্য যমক। যেমন -

পাইয়া চরণতরী তরি ভবে আশা।' - ভারতচন্দ্র

এখানে তরী মানে নৌকা এবং তরি মানে পার হওয়া। মাঝে যমক হয়েছে বলে মধ্য যমক হয়েছে। আরো উদাহরণ হল -

আবরিছে দিননাথে ঘন ঘনরূপে। - মধুসূদন।

আমি যাহা ভাল কই তুমি তাহা কর কই। - ঈশ্বর গুপ্ত।

অন্ত্যযমক:

দুই চরণের বা দুই পদের শেষ শব্দ দুটিতে যমক হলে তাকে বলে অন্ত্যযমক। যেমন -

ওরে রে দারুণ বিধি।

তোর এ দারুণ বিধি।। - কৃষ্ণকমল গোস্বামী

প্রথম বিধি = বিধাতা, দ্বিতীয় বিধি = নিয়ম।

কিম্বা -

আটপণে আধসের কিনিয়াছি চিনি।

অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।। - ভারতচন্দ্র।

প্রথম চিনি = শর্করা, দ্বিতীয় চিনি - জানি।

সর্বযমক:

এক চরণের সঙ্গে যদি অন্য চরণের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সমস্ত শব্দেই যমক হয় তবে তাকে সর্ব যমক বলে। বাংলায় এই ধরনের যমকের ব্যবহার নেই বলেই চলে। ঈশ্বর গুপ্তের লেখার একটি অংশেই এই যমকের পরিচয় পাওয়া যায়, যা আমরা আগেই বিশ্লেষণ করেছি। এখানে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হ'ল -

কান্তার আমোদপূণর্ণ কান্ত সহকারে

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।

আবার সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী যমকের দুই ভাগ - সার্থক যমক এবং নিরর্থক যমক।

সার্থক যমক :

সাধারণ যমক অলংকারই হল সার্থক যমক। অর্থাৎ যে যমক অলংকারে একই রকম উচ্চারিত শব্দগুলির পৃথক পৃথক অর্থ থাকে, তাকে বলে সার্থক যমক। যেমন -

কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি জেতে নারী
আমি হে। -ঈশ্বরগুপ্ত।

এই উদাহরণে 'যেতে' ও 'জেতে' এবং 'নারি' ও 'নারী'র যমক হয়েছে। যেতে = যাওয়া অর্থে 'যাইতে'। এবং জেতে = জাতিতে। নারি = না পারি এবং নারী = স্ত্রীলোক। আসলে পূর্বে আলোচ্য চারপ্রকার যমকই সার্থক যমক।

নিরর্থক যমক :

যে যমক অলংকারে সমোচ্চারিত ধ্বনিসমবায়ের অন্তত একটি অর্থহীন, তাকে বলে নিরর্থক যমক। যেমন -

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

এখানে 'বনে' এই ধ্বনিসমবায়টি ঘিরে যমক হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় 'বনে' মানে হ'ল অরণ্যে। কিন্তু প্রথম 'বনে' ধ্বনি সমবায়টি আসলে যৌবনে শব্দের শেষ অংশ। কাজেই এর আলাদা কোন অর্থ নেই। এটি তাই নিরর্থক যমক। আসলে বাংলায় একে অনুপ্রাস বলাই সংগত। নির্দিষ্টভাবে ছেকানুগ্রাস বলা উচিত।

যমক ও অনুপ্রাসের পার্থক্য :

একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহার করা হলে যমক হয়। আর একই বর্ণগুচ্ছকে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী যুক্ত বা বিযুক্ত ভবে দুবার আবৃত্তি করলে ছেকানুপ্রাস ও বহুবার আবৃত্তি করলে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়। যমকে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনুপ্রাস অর্থ নিরপেক্ষ।

শ্লেষ :

শ্লেষ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল : শ্লিষ + অ। 'শ্লিষ' ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন করা। একি শব্দের মধ্যে একাধিক অর্থের লগ্নতা থাকে শ্লেষ অলংকারে। শ্লেষ অলংকারের সংজ্ঞায় বলা যায় -

একটি শব্দ যদি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে একাধিক অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শ্লেষ অলংকার বলে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যেমন -

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ চরাচর,

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ? -ঈশ্বর গুপ্ত

এখানে সমগ্র বাক্যের মধ্যে দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। একটি অর্থ - যে ভগবান চরাচরে ব্যাপ্ত, যাঁর আলোকে সূর্য আলোকিত তাঁকে কে বলে গুপ্ত ? আরেকটি অর্থ হল - যার প্রতিভায় 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্রিকা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয় সেই ঈশ্বর গুপ্তকে অখ্যাতনামা কে বলে ? তঁর খ্যাতি চরাচরে ব্যাপ্ত। সুতরাং এটি শ্লেষ অলংকারের উদাহরণ। শ্লেষের ব্যঞ্জনা সমস্ত বাক্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে বলে একে বাক্যগত শ্লেষ বলে। আবার -

মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে। -মধুসূদন।

এখানে 'মধু' শব্দের দুটি অর্থ। এক, কবি মধুসূদন এবং দুই, 'মউ'। এখানে শ্লেষের ব্যঞ্জনা একটি মাত্র শব্দের মধ্যে নীহিত বলে একে শব্দগত শ্লেষ বলা হয়।

এই শ্লেষ অলংকার দুই প্রকারের হয়। যথা - সভঙ্গ শ্লেষ ও অভঙ্গ শ্লেষ।

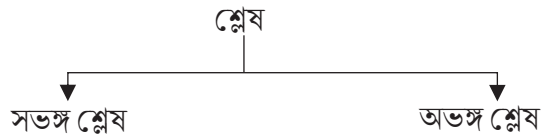

সভঙ্গ শ্লেষ :

যদি শব্দকে ভেঙে একটি অর্থ এবং না ভেঙে একটি অর্থ পাওয়া যায়, তবে সেই শ্লেষকে বলে সভঙ্গ শ্লেষ। যেমন -

পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যো বংশ খ্যাত। -ভারতচন্দ্র

এখানে 'কুলীন' শব্দটির একটি অর্থ সদ্বংশজাত। আবার শব্দটিকে কু-লীন এভাবে ভাঙলে অর্থ হয় পৃথিবীতে মগ্ন (কু = পৃথিবী, লীন = মগ্ন)। ভেঙে এবং না ভেঙে এখানে অর্থ পাওয়া গেল। তাই এটি সভঙ্গ শ্লেষ। এরকম আরো কিছু উদাহরণ শুধু উল্লেখ করা হল -

(ক) অপরূপ রূপ কেশবে। (কে - শবে অর্থাৎ কালী, আবার কেশবে = কৃষ্ণে)

দেখরে তোরা এমনধারা কালো রূপ কি আছে ভবে।। - দাশরথি রায়

(খ) পৃথিবীটা কার বশ ?

পৃথিবী টাকার বশ।

(গ) সীতার অপর নাম জানকী ?

সীতার অপর নাম জানকী।

অভঙ্গ শ্লেষ :

শব্দকে তার পূর্ণরূপে রেখেই যদি তাকে একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে বলে অভঙ্গ শ্লেষ। তবে এক্ষেত্রে শব্দের একাধিক অর্থ থাকা চাই।

যেমন -

আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজ গুণে। - কবিকঙ্কণ

এই উদ্ধৃতিতে 'গুণে' শব্দটিকে না ভেঙে, তাকে পূর্ণরূপে রেখেই দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তা হল - স্বভাবে ও ধনুকের ছিলায়। এই কারণে এটি অভঙ্গ শ্লেষ। এমনই -

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ -ভারতচন্দ্র।

(বৃদ্ধ = বুড়ো এবং মহাদেব, সিদ্ধিতে = মাদক দ্রব্য বিশেষ ও মোক্ষদানে)

কিম্বা -

অনেকের পতি তাই পতি মোর বাম - ভারতচন্দ্র

(বাম = বিমুখ, বাম = মহাদেব)

শ্লেষ ও যমকের তুলনা :

দুটিই শব্দালংকার। দুটিতেই অর্থ এক রেখে শব্দ বদলে দিলে আর অলংকার থাকে না। দুটিই শ্রাব্য কাব্যের জগতে গুরুত্বপূর্ণ, এবং দুই ক্ষেত্রেই শব্দের দ্ব্যর্থকতা দরকার। এছাড়া যমকে একই শব্দ বা একই রকম উচ্চার্য শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয় , কিন্তু শ্লেষ অলংকারে শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়। যমকে একটি শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে একাধিক অর্থ সৃষ্টি করে। কিন্তু শ্লেষে শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে একাধিক অর্থ উৎপন্ন করে। যমকে অর্থের গুরুত্ব থাকলেও শব্দের ধ্বনিরূপের গুরুত্বই বেশি। কিন্তু শ্লেষ অলংকারে শব্দ ও অর্থের গুরুত্ব সমান।

বক্রোক্তি :

কোন বক্তব্যকে সোজাভাবে না বলে প্রশ্ন বা স্বরবিকৃতির সাহায্যে বাঁকা ভাবে বলা হলে, কিংবা বক্তার অভিপ্রেত অর্থকে এড়িয়ে তার কথাকে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হলে বক্রোক্তি অলংকার হয়। যেমন -

'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?' - মধুসূদন।

এখানে উক্তিটি একটি প্রশ্ন। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে বক্তা বলতে চান যে তিনি ভিখারী রাঘবকে ভয় পান না। অর্থাৎ সোজা কথাকে সোজা ভাবে না বলে, বলা হল বাঁকা ভাবে, প্রশ্নের আশ্রয়ে। আবার -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

‘শিক্ষক - পড়ছ তো ?

ছাত্র - পড়ব কেন ? পা টিপে টিপে চলি।’

এখানে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ পড়াশুনোর কথাকে এড়িয়ে শ্রোতা বাঁকাভাবে অন্য অর্থ পড়ে যাওয়া করল। তাই উভয় ক্ষেত্রেই বক্রোক্তি অলংকার হল।

বক্রোক্তির শ্রেনীবিভাগ :

কাকু বক্রোক্তি :

কাকু শব্দের অর্থ, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি। কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্য যদি হ্যাঁ বাচক কথার না বাচক অর্থ এবং না - বাচক কথার হ্যাঁ - বাচক অর্থ প্রকাশ পায়, তবে কাকু বক্রোক্তি অলংকার হয়। যেমন -

‘কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে ? - জীবনানন্দ।

এখানে হ্যাঁ - বাচক প্রশ্নটির মধ্যে রয়েছে না - বাচক অর্থ। অর্থাৎ কেউ হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে না। কিম্বা একই রকম ভাবে এই উদাহরণে না বাচক প্রশ্নে হ্যাঁ - বাচক অর্থ আছে -

‘মাতা আমি নহি ? গর্ভভার জর্জরিত

জাগ্রত হৃৎপিন্ড তলে বহি নাই তারে ?’ - রবীন্দ্রনাথ।

শ্লেষ বক্রোক্তি :

যদি বক্তা এক অর্থে একটি কথা বলেন এবং শ্রোতা চাতুর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে তা গ্রহণ করেন, তবে তা শ্লেষ অলংকার হয়। এক্ষেত্রে শব্দের একাধিক অর্থ বা শ্লেষের সুযোগে বক্রোক্তিটি সৃষ্টি হয় বলে একে শ্লেষ বক্রোক্তি বলে। যেমন -

‘প্রশ্ন - দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন ?

উত্তর - রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

এখানে ‘দ্বিজ’ মানে ‘ব্রাহ্মণ’ এবং ‘বারুণী’ অর্থ ‘মদ’। এই অর্থ ধরে বক্তা প্রশ্ন করেছেন - ব্রাহ্মণ হয়ে কেন মদ সেবন করো ? কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্রোতা ‘দ্বিজ’ অর্থে ‘চন্দ্র’ এবং বারুণী’ অর্থে ‘পশ্চিম দিক’ ধরে উত্তর দেন - সূর্যের ভয়ে চন্দ্র পলায়ন করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রশ্নকর্তার অভিপ্রেত অর্থ ব্রাহ্মণ গ্রহণ না করে অন্য অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন। তাই এখানে সংজ্ঞানুযায়ী শ্লেষ বক্রোক্তি অলংকার হয়েছে। আর একটি উদাহরণ -

সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন দুঃখে?" -রবীন্দ্রনাথ।

সভাকবি 'অর্থ' বলতে 'অভিধেয় তাৎপর্য' (Meaning) বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু নটরাজ সেই অভিপ্রেত অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ না করে 'টাকাকড়ি' মানে করে উত্তর দিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে বক্তার বক্তব্যের যথার্থ অর্থ না বুঝে যদি শ্রোতা অন্য রকম উত্তর দেন, তবে সে ক্ষেত্রে শ্লেষ বক্রোক্তি হয়ে না। বক্তার বক্তব্যকে ভালো ভাবে অনুধাবন করে যদি কৌতুক বা রমণীয়তা সৃষ্টির জন্য শ্রোতা তাকে অন্য অর্থে গ্রহণ করে উত্তর দেন তবেই এই অলংকার আত্মপ্রকাশ করবে। এই শ্লেষ -বক্রোক্তির প্রয়োগ ও বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কমে গেছে বলা চলে।

অর্থালংকার :

যে অলংকার একান্তভাবে অর্থের ওপর নির্ভরশীল, অর্থ অক্ষুন্ন রেখে শব্দ বদলে দিলেও যে অলংকার অক্ষুন্ন থাকে, তাকেই বলে অর্থালংকার। যেমন -

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নটোরের বনলতা সেন'।

- জীবনানন্দ।।

বনলতা সেনের চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের তুলনা করা হয়েছে। পাখির নীড় যেমন পাখির আশ্রয়স্থল' বনলতা সেনের চোখও কবির কাছে গভীর আশ্রয়। এই তুলনার মধ্যেই কবি আবেগটি রূপ পেয়েছে। এভাবেই বাক্যটি সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই তুলনা তাই অলংকার হয়ে উঠেছে। অর্থই এখানে প্রধান বিষয়, ধ্বনি নয়। তাই এটি অর্থালংকার। এবার এর কিছু শব্দ অদল বদল করে দেওয়া যাক।

"পাখির বাসার মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' কিংবা পাখির নীড়ের মতো আঁখি তুলে নটোরের বনলতা সেন' অথবা 'বিহঙ্গের নীড় সম চক্ষু তুলে নাটোরের বনলতা সেন'।

এখানে শব্দ পাল্টে দিলেও, অর্থ একই থাকছে। অর্থাৎ অলংকার অক্ষুন্ন থাকছে। বোঝাই যাচ্ছে, শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছ নয়, তার অর্থটিই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অর্থালংকারের শ্রেনীবিভাগ :

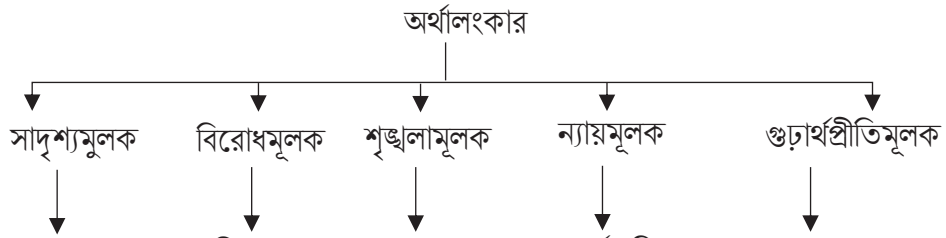

সাদৃশ্যমুলক	বিরোধমূলক	শৃঙ্খলামূলক	ন্যায়মূলক	গুঢ়ার্থপ্রীতিমূলক
১. উপমা	বিরোধাভাস	কারণমালা	অর্থাপতি	অপ্রস্তুত প্রশংসা
২. উৎপ্রেক্ষা	বিভাবনা	একাবলী	কাব্যলিঙ্গ	অর্থান্তরন্যাস
৩. রূপক	বিশেঢ়োক্তি	সার	অনুমান	আক্ষেপ
৪. সন্দেহ	অসঙ্গতি	মালাদীপক	পর্যায়	পর্যায়োক্ত
৫. অপহ্নুতি	বিষম		পরিবৃত্ত	পরিকর
৬. নিশ্চয়	বিচিত্র		সমুচয়	সূক্ষ্ম
৭. ব্যাতিরেক	অধিক		পরিসংখ্যা	ব্যাজোক্তি
৮. সমাসোক্তি	অনুকূল		উত্তর	স্বভাবোক্তি
৯. অতিশয়োক্তি	ব্যাঘাত		সমাধি	ভাবিক
১০. ভ্রান্তিমান	অন্যোন্য		সামান্য	উদাও
১১. দৃষ্টান্ত			তদগুণ	
১২. প্রতীপ				
১৩. উল্লেখ				
১৪. দীপক				
১৫. তুল্যযোগিতা				
১৬. প্রতিবস্তুপনা				
১৭. নিদর্শনা				
১৮. সামান্য				
১৯. সহোক্তি				
২০. অর্থশ্লেষ				

সাদৃশ্যমূলক অলংকার :

যে অলংকারে দুটি বিজাতীয় বা অসম বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল দেখানো হয়, তাকে বলে সাদৃশ্যমূলক অলংকার।

সাদৃশ্যমূলক অলংকারের চারটি অঙ্গ :

(ক) উপমেয়

(খ) উপমান

(গ) সাধারণ ধর্ম

(ঘ) সাদৃশ্যবাচক শব্দ

টিপ্পনী

(ক) উপমেয় :

যে বস্তুটি বর্ণনীয়, অর্থাৎ যে বস্তুর সঙ্গে কোন বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাকেই বলে উপমেয়। যেমন -

'বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।' -রবীন্দ্রনাথ।

এখানে বর্ণনীয় বিষয় বুদ্ধের আঁখি। বুদ্ধের আঁখির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে সন্ধ্যাতারার। সুতরাং এখানে 'আঁখি' হল উপমেয়। এক কথায় যাকে তুলনা করা হয় (এখানে 'আঁখি') সে হল উপমেয়।

(খ) উপমান :

বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয়র সঙ্গে যে বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য দেখানো হয়, সেই বিজাতীয় বস্তুকেই বলে উপমান। বা এককথায় যার সঙ্গে তুলনা করা হয় সেই হল উপমান। আগের উদাহরণে আঁখিকে তুলনা করা হয়েছে সন্ধ্যাতার সঙ্গে। তাই সন্ধ্যাতারা হল উপমান।

(গ) সাধাণ ধর্ম :

যে ধর্ম বা গুণ উপমেয় ও উপমানের মধ্যে বিদ্যমান (Common) থাকে, তাকে বলে সাধারণ ধর্ম।

যেমন - 'পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি।

এখানে পদ্মের কলিও ক্ষুদ্র এবং মুষ্টিও ক্ষুদ্র। তাই সাধারণ ধর্ম হল ক্ষুদ্র। মুষ্টি - উপমেয়, পদ্ম - উপমান।

(ঘ). সাদৃশ্যবাচক শব্দ :

সাদৃশ্যমূলক অলংকারে দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়। এই সাদৃশ্য দেখানোর জন্য কখনো দরকার পড়ে এক বা একাধিক শব্দের। যেমন - মতো, সম, পারা, সদৃশ, যথা, যেন, শঙ্কাশ, পরায়, নিভ, প্রতিম, রীতি, হেন, প্রায়, তুল্য, ন্যায়, বৎ ইত্যাদি। এগুলিকেই বলে সাদৃশ্যবাচক শব্দ। আগের উদাহরণে আছে -

পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি।

টিপ্পনী

এখানে 'সম' শব্দটি হ'ল সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

সাদৃশ্যমূলক অলংকার আলোচনা করতে গেলে এই চারটি উপাদান ভীষণ জরুরী। তাই এই উপাদানগুলি সম্পর্কে প্রথমে পরিচিতি দিয়ে নেওয়া হল।

উপমা অলংকার :

যদি একটিমাত্র বাক্যে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট দুই বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাহলে উপমা অলংকার হয়। যেমন -

'মেয়েটি দিন দিন লতার মত বাড়িয়া উঠিতেছে।'

এখানে 'মেয়েটি' ও 'লতা ' দুটি বিজাতীয় পদার্থ। উভয়ের মধ্যে 'বেড়ে ওঠার' ব্যাপারে সাদশ্য আছে। একই বাক্যের মধ্যে এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। সুতরাং এই উদাহরণটি উপমা অলংকারের উদাহরণ।

উপমার শ্রেনীবিভাগ :

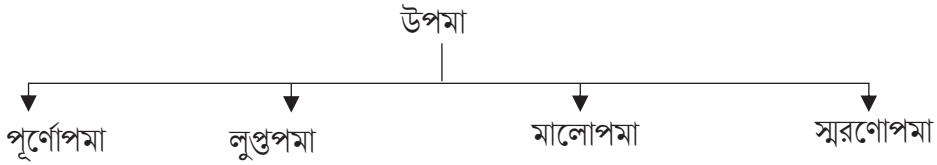

পূর্ণোপমা :

যে উপমা অলংকারে উপমার সব কটি অঙ্গ অর্থাৎ উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ - এই চারটি অঙ্গই বিদ্যমান তাকে পূর্ণোপমা অলংকার বলে। যেমন -

"তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।'

-জীবনানন্দ

এখানে উপমেয় - চোখ। উপমান - বেতের ফল, সাধারণ ধর্ম - ম্লান এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মতো। এখানে উপমার চারটি অঙ্গই বিদ্যমান। তাই এটি পূর্ণোপমা অলংকারের উদাহরণ।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
50

পূর্ণোপমার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল -

'নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল।' - জীবনানন্দ

উপমেয় - নদীর জল, উপমান - মচকা ফুলের পাপড়ি, সাধারণ ধর্ম লাল, সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মতো।

'কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।'

উপমেয় - কানুর পীরিতি, উপমান - চন্দন, সাধারণ ধর্ম - সৌরভময়, সাদৃশ্যবাচক শব্দ - রীতি।

'চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।' - রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় - আলো, উপমান - আশা, সাধারণ ধর্ম - চঞ্চল, কাঁপিছে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মতন।

'অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।' - কবিকঙ্কণ

উপমেয় - চইতের খরা, উপমান - অনল, সাধারণ ধর্ম - পোড়ে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ - সমান।

লুপ্তপমা :

যে উপমা অলংকারে উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে কোনো একটি বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত বা উহ্য থাকে, তাকে লুপ্তোপমা বলে। যেমন -

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন ।' - জীবনানন্দ।

এখানে উপমেয় - চোখ, উপমান - পাখির নীড়, সাধারণ ধর্ম - উহ্য / লুপ্ত। সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মতো।

আরোকিছু লুপ্তোপমার উদাহরণ -

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' - জীবনানন্দ

উপমেয় - উল, উপমান - বিদিশার নিশা, সাধারণ ধর্ম - অন্ধকার, সাদৃশ্যবাচক শব্দ - উহ্য / লুপ্ত।

'করাতের মতো চাঁদ উঠেছে।' - মনীন্দ্র গুপ্ত

উপমেয় - চাঁদ, উপমান - করাত, সাধারণ ধর্ম - উহ্য, সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মতো।

মলোপমা :

যে উপমা অলংকারে একটি উপমেয়র সঙ্গে একাধিক উপমানের তুলনা করা হয়, এক কথায় একটি উপেয়র একাধিক উপমান থাকে, তাকে মালোপমা অলংকার বলে। যেমন -

"তোমার সে চুল

জড়ানো সুতোর মতো, নিশীথের মেঘের মতন।' - বুদ্ধদেব বসু।

এখানে উপেয় - চুল। এর একাধিক উপমান হল - জড়ানো সুতো এবং নিশীথের মেঘ। এছাড়া -

'সুখ অতি সহজ সরল, কাননের

টিপ্পনী

প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের

হাসির মতন।' - রবীন্দ্রনাথ।

উপমেয় - সুখ, উপমান - ১. কাননের প্রস্ফুট ফুল, ২. শিশু আননের হাসি।

স্মরণোপমা :

টিপ্পনী

একটি বস্তুকে দেখে বা প্রত্যক্ষ অনুভব করে যদি অপর একটি বিজাতীয় বস্তুর স্মৃতি মনে জেগে ওঠে, তবে স্মরণোপমা অলংকার হয়। স্মৃতি এখানে দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে উপমেয় উপমান ভাব রচণা করে দেয়। যেমন -

"কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে

নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।। - চন্ডীদাস

এখানে কালোজল দেখে রাধার কৃষ্ণের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু এতো শুধু স্মৃতিমাত্র নয়, কালো জলের সঙ্গে কৃষ্ণের সাদৃশ্যটিই মূলকথা। কালো রঙের মধ্যস্থতায় জল হয়ে উঠেছে কৃষ্ণের অপ্রতিরোধ্য উপমান। কিম্বা -

"শুধু যখন আশ্বিনেতে

ভোরে শিউলি বনে

শিশির ভেজা হাওয়া বেয়ে

ফুলের গন্ধ আসে

তখন কেন মায়ের কথা

আমার মনে ভাসে?' - রবীন্দ্রনাথ।

এখানে স্মৃতির ওপর ভর করে মায়ের কোমল স্নেহের সঙ্গে শিউলি ফুলের মৃদ্য গন্ধের সূক্ষ্ম তুলনা ঘটেছে।

রূপক :

উপমেয়কে অপহ্নব (গোপন) না করে তার ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক অলংকার হয়। এককথায় উপমেয়র সঙ্গে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে হয় রূপক অলংকার।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
52

রূপক অলংকারে উপমেয় ও উপমান উভয়ই বর্তমান থাকে। মূলত এদুটি বিসদৃশ হলেও এদের মধ্যে অতিসাম্য দেখানোর জন্য দুটিকে অভেদরূপে কল্পনা করা হয়। তবে রূপক অভেদ সর্বস্ব অলংকার নয়। কারণ এতে উপমেয় অস্বীকৃত নয়, তার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম - এই যা। উপমেয়র উপর উপমানকে এমনভাবে আরোপ করা হয়, যাতে উপমানই প্রধান হয়ে ওঠে। কাজেই রূপক অলংকারের সামান্য ধর্মটি উপমানেরই অনুগত হয়। যেমন -

'এমন মানব জমিন্ রইল পতিত

আবাদ করলে ফলতো সোনা।' - রামপ্রসাদ।

এখানে উপমেয় "মানবের সঙ্গে উপমান 'জমিনের' অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। 'আবাদ করা' - এই ক্রিয়া উপমান 'জমিনের' অনুযায়ী। অর্থাৎ উপমেয়র উপর উপমান আরোপিত হয়েছে। তাই এটি রূপক অলংকার।

রূপক অলংকারের শ্রেণীবিভাগ :

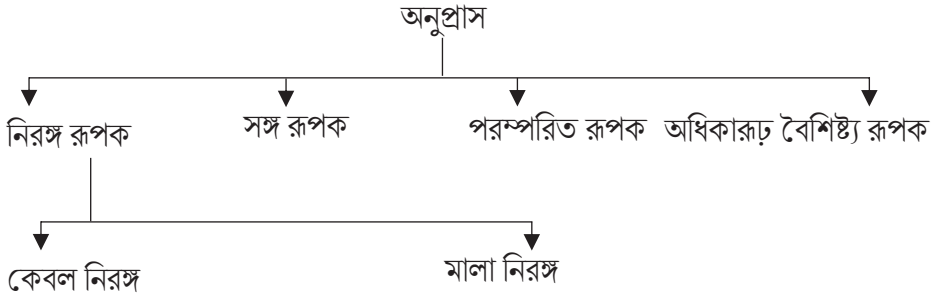

নিরঙ্গ রূপক :

যে রূপক অলংকারে একটিমাত্র উপমেয়র সঙ্গে এক বা একাধিক উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন নিরঙ্গ রূপক অলংকার হয়। নিরঙ্গ রূপকে যদি একটি মাত্র উপমান থাকে, তবে তাকে বলে' কেবল নিরঙ্গ রূপক' অলংকার। আর উপমান যদি একাধিক হয় তাকে বলে 'মালা নিরঙ্গ রূপপ' অলংকার। যেমন -

'হৃদি - পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে' -রামপ্রসাদ।।

এখানে 'হৃদি' উপমেয় এবং এর একটি মাত্র উপমান 'পদ্ম'। তাই এটি 'কেবল নিরঙ্গ রূপক'।

'শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষের বা।

বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।। -বিদ্যাপতি

এখানে উপমেয় একটি 'পিয়া' (প্রেমিক কৃষ্ণ)। উপমান একাধিক 'শীতের ওড়নী', 'গিরিষের বা' (গ্রীষ্মের বাতাস), 'বরিষার ছত্র', 'দরিয়ার না' (সমুদ্রের নৌকো)। তাই এটি মালা নিরঙ্গ রূপক।

সাঙ্গ রূপক :

যে রূপক অলংকারে উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনার পাশাপাশি উপমেয়র বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে উপমানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গেরও অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে সাঙ্গ (অঙ্গ সমেত) রূপক অলংকার বলে। যেমন -

'শোকের ঝড় বহিল সভাতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শোভিল চৌদিকে সুর সুন্দরীর রূপে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।' -মধুসূদন।

এখানে মূল উপমেয় - শোক, মূল উপমান - ঝড়। মূল উপমেয় শোকের পাঁচটি অঙ্গ - বামাকুল, মুক্তকেশ, নিশ্বাস, অশ্রুবারিধারা, হাহাকার রব। মূল উপমান ঝড়ের অঙ্গও পাঁচটি - সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎ), মেঘমালা, বায়ু, আসার, জীমূত-মন্দ্র । পাঁচটি অঙ্গসমেত মূল উপমেয় শোকের সহিত পাঁচটি অঙ্গ সমেত মূল উপমান ঝড়ের অভেদ কল্পিত হওয়ায় উদাহরণটিতে সাঙ্গ রূপক অলংকার হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ -

'জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কতদিন রবে।' - মধুসূদন

এখানে মূল উপমেয় 'জীবন' মূল উপমান 'উদ্যান' । উপমেয়র অঙ্গ 'যৌবন' উপমানের অঙ্গ 'কুসুম'। মূল উপমেয় - উপমানের অভেদ কল্পনার পাশাপাশি এদের অঙ্গদুটির মধ্যেও অভেদ কল্পিত হয়েছে।

পরম্পরিত রূপক :

যদি একটি উপমেয়র সঙ্গে একটি উপমানের অভেদ কল্পনা অন্য উপমেয়র সঙ্গে অন্য উপমানের অভেদ কল্পনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়। যেমন -

'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে।' - মধুসূদন

এখানে প্রথম রূপক 'জীবতারা' । উপমেয় 'জীব' (জীবন) উপমান 'তারা' জীবনকে তারার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখানোর কারণেই দেহকে আকাশ বলতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম রূপকটি দ্বিতীয় রূপকের কারণ।

একইরকম আরো দু'একটি উদাহরণ -

ক. কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি,
আঁধারি হৃদয়াকাশ তুই পূর্ণশশী
আমার ?

খ. জীবন উদ্যানে তোর যৌবন - কুসম ভাতি
কতদিন রবে ?

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক :

'অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে হয় - অধিক + আরূঢ় + বৈশিষ্ট্য। অধিক অর্থে বাড়তি, অতিরিক্ত, অসম্ভব ইত্যাদি। আর আরূঢ় মানে চেপে বসা , চাপানো, আরোপিত করা। অর্থাৎ, বাড়তি বা অসম্ভব বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যে রূপক তাই অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক। এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় এই ভাবে -

যে রূপক অলংকারে উপমানের ওপর কোনো অসম্ভব বৈশিষ্ট্য আরোপ করে উপমেয়র সঙ্গে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে বলে অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক। যেমন -

'থির বিজুরি নবীনা গোরী পেখনু ঘাটের কুলে। - চন্ডীদাস।

এখানে 'বিজুরীর' (বিজলীর) বিশেষণ 'থির' (স্থির) হতে পারে না, স্থিরতা বিজলীর পক্ষে একটি অসম্ভব বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই অবাস্তব বৈশিষ্ট্যটি বিজলীর ওপর (উপমান) অধিক অরূঢ় করে উপমেয় 'গোরী' (রাধা) আর সঙ্গে তার অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। তাই এটি অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার হয়েছে।

এক জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ -

(ক) 'হেরি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার' - কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

(খ) 'অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম
দুয়েরি বল্গা নাই।

উপমা ও রূপকের পার্থক্য :

(ক) লুপ্তোপমা ছাড়া অন্যান্য উপমায় উপমার চারটি অঙ্গই বিদ্যমান থাকে। রূপকে থাকে দুটি মাত্র অঙ্গ - উপমেয় ও উপমান।

(খ) উপমান ও উপমেয়র মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে, উপমায়। শুধু কোন না কোন দিন থেকে সাদৃশ্য দেখানো হয়। রূপকে উপমেয় ও উপমানের অতি-সাদৃশ্যের জন্য তাদের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে অভেদ কল্পিত হয়।

(গ) উপমায় উপমেয় গুরুত্বপূর্ণ। রূপকে উপমান বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) উপমায় উপমেয় অনুযায়ী হয় ক্রিয়াপদ, কিন্তু রূপকে উপ-মান অনুযায়ী হয় ক্রিয়াপদ।

উৎপ্রেক্ষা :

'উৎপ্রেক্ষা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল - উৎ-প্র-ঈক্ষ (দর্শন করা, বিতর্ক করা) + অ + আ (স্ত্রীং) । এর আভিধানিক অর্থ 'প্রকৃত বস্তুতে অপ্রকৃত বস্তুর আরোপ, উপমেয়তে উপমান

টিপ্পনী

স্বরূপে যে সম্ভাবনা বা সংশয় হয়, বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত বিষয়ান্তরের অভেদকল্পনা।' সাধারণ ভাবে 'উৎপ্রেক্ষা' শব্দের অর্থ সংশয় বা সন্দেহ। সাদৃশ্যমূলক অলংকারগুলির মধ্যে উৎপ্রেক্ষা একটি প্রধান অলংকার। এর সংজ্ঞা হল -

"যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় প্রকাশ করা হয়, তাকে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে।"

টিপ্পনী

এই অলংকারে উপমানের প্রতি এমন আকর্ষণের সৃষ্টি হয় যাতে উপমান অর্থাৎ সংশয়ের বস্তুটিকেই সত্য বা প্রধান বলে মনে হয়, যেমন -

'কুহেলী গেল, আকাশে আলো
দিল যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।'

এখানে উপমেয় 'কুহেলী গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'র চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে উপমান 'ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।' এটি কবির কল্পনায় অসাধারণ চমৎকারিত্ব লাভ করল। এবং সংশয় তৈরী হ'ল আকারের আলো ও পার্বতীর হাসির মধ্যে। এখানে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হল। কিম্বা -

বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল। - মধুসূদন

এখানে উপমেয় - সীতার পদতলে উপবিষ্ট সরমা। উপমান - তুলসীতলায় প্রজ্বলিত সুবর্ণ দেউটি। উপমেয় সরমাকে উপমান দেউটি (প্রদীপ) বলে কবির যে প্রবল সংশয় হয়েছে, তা 'যেন' শব্দের ব্যবহারেই বোঝা যাচ্ছে। তাই এটি একটি উৎপ্রেক্ষা অংলকারের উদাহরণ।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের প্রকারভেদ -

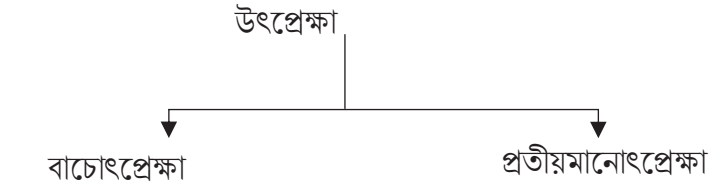

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
56

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা :

যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উৎপ্রেক্ষা বা সংশয়টি ভাষায় ব্যক্ত অর্থাৎ যেখানে যেন, জনু, বুঝি, প্রায় ইত্যাদি সংশয়বাচক শব্দের দ্বারা উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় প্রকাশ করা হয়, তাকে বলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। যেমন -

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।

পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। -সুকান্তভট্টাচার্য্য

এখানে উপমেয় - চাঁদ, উপমান - রুটি। 'যেন' শব্দটির দ্বারা উপমেয় চাঁদ' কে উপমান 'রুটি বলে প্রবল সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। এরকম ই -

'পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।' -রবীন্দ্রনাথ

এখানে উপমেয় - অশ্রু, উপমান - বাল্মীকির শ্লোক। 'যেন' বাচ্যোৎপ্রেক্ষা নির্দেশ করছে।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :

যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে সংশয়বাচক শব্দ যেন, জনু, বুঝি, মনে হয় ইত্যাদি উপস্থিত থাকে না, কিন্তু পরোক্ষো উৎপ্রেক্ষাটি বুঝে নেওয়া যায়, তাকেই বলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার। যেমন -

'কি পেঁখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।' -গোবিন্দদাস।

এই পংক্তির অর্থ হল, নর্তক শ্রেষ্ঠ কিশোর গৌরাঙ্গকে কি রূপেই না দেখলাম। সুরধুনীর তীর উজ্জ্বল করে যেন একটা অভিনব সোনার কল্পবৃক্ষ চলে বেড়াচ্ছে। সুতরাং এখানে নৃত্য ও ভ্রমণরত শ্রীচৈতণ্যকে (উপমেয়) একটি সঞ্চরমান সোনার গাছ (উপমান) বলে সংশয় হয়েছে, কিন্তু কোন সংশয়সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। তাই এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ। আবার -

পাতলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে -
দেবশিশুদের কাগজের নৌকা। -রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় 'মেঘের টুকরো' কে উপমান 'নৌকা' বলে সংশয় হচ্ছে। কিন্তু কোন সংশয় সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। একই রকম -

একখানি গ্রাম শোভে জলময় মাঠে,
গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা গগণ ললাটে।' -গোবিন্দচন্দ্র দাস।

এখানে 'গঙ্গা মৃত্তিকার' আগে সংশয়সূচক 'যেন' শব্দ বসিয়ে অর্থ করলে সংশয়ের ভাবটি ঠিক ফুটে উঠবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সন্দেহ :

যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষেই সমান সংশয় থাকে, তাকে সন্দেহ অলংকার বলে।

এই অলংকারে উপমেয় সত্য না উপমান সত্য সে বিষয়ে কবি সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করেন । এইউ অলংকারের বাক্য হয় সাধারণত প্রশ্নবাচক। উদাহরণ -

সোনার হাতে সোনার চুড়ি, কে কার অলংকার ? -মোহিতলাল

এখানে উপমেয়- সোনার হাত, উপমান - সোনার চুড়ি । সোনার হাতে সোনার চুড়ি অলংকার হতে পারে, আবার সোনার চুড়ির পক্ষে সোনার হাত অলংকার হতে পারে। উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষেই সমান সংশয় দেখা দিয়েছে বলে এটি সন্দেহ অলংকার, আবার -

'চেয়ে দেখ রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ? -মধুসূদন

মেঘনাদপত্নী প্রমীলার দূতী নৃমুন্ডমালিনীর রামচন্দ্রের শিবিরদ্বারে আবির্ভাবে এই সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। একি কেবল কোন নারী, নাকী উষা ? উভয়পক্ষে সংশয় বলে সন্দেহ অলংকার হয়েছে। এমন আরো একটি দু'টি উদাহরণ -

'কে জেগেছে ? ফুল না আমি?' -বুদ্ধদেব বসু

বা, 'মনে হল মেঘ, মনে হ'ল পাখি, মনে হ'ল কিশলয়, ভালো করে যেই দেখিবারে যায় মনে হ'ল কিছু নয়। দুইধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল, অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল।' -রবীন্দ্রনাথ।

নিশ্চয় :

যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়কেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়, তাকে বলে নিশ্চয় অলংকার। এই অলংকারে না, নেই, নয়, নহে ইত্যাদি নিষেধমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন -

অসীম নীরদ নয়
ঐ গিরি হিমালয়। -বিহারীলাল চক্রবর্তী।

এখানে উপমেয় 'গিরি হিমালয়' উপমান 'অসীম নীরদ' । উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়কেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছ । তাই এটি নিশ্চয় অলংকার হয়েছে। এছাড়া -

'নয়নে ফেলিত ছায়া - মেঘ নয়, তব কেশপাশ। -অজিত দত্ত

এই উদাহরণে উপমেয় - কেশপাশ, উপমান - মেঘ। প্রেয়সীর নয়নে যা ছায়া ফেলত তা উপমান মেঘ নয়, উপমেয় কেশপাশ, সুতরাং এখানকে উপমানকে অস্বীকার করে

উপমেয়কেই পচরতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে বলে এটি নিশ্চয় অলংকার। আবার -

নমি সেই মানবীরে

দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা। -মেহিলাল

এখানে উপমান দেবী ও অপ্সরাকে অস্বীকার করে মানবীকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। তাই নিশ্চয় অলংকার হয়েছে। আর একটা উদাহরণ -

রোধিছে যে কোলাহল, বলি

শ্রবণ-কুহর এষে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;

গরজে রাক্ষসচমু মাতি বীরমদে।

উপমান - রাক্ষসচক্ষু , উপমেয় - সিন্ধুধ্বনি, উপমেয় অস্বীকৃত হয়েছে।

অপহ্নুতি :

'অপহ্নব' (অপ-হ্ন + অ) শব্দের অর্থ অস্বীকার করা , গোপন করা, যা আছে তা নেই বলে গোপন করা।

যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়, তাকে অপহ্নুতি অলংকার বলে। যেমন -

চোখে চোখে কথা নয়গো, বন্ধু,

আগুনে আগুনে কথা। -অন্নদাশঙ্কর রায়

উপমেয় - চোখ, উপমান - আগুন। এই উক্তিতে চোখকে অস্বীকার করে আগুনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাই এটি অপহ্নুতি অলংকার। কিম্বা -

'আশীর্বাদ - ছলে মনে নমিতাম আমি। -মধুসূদন

উপমেয় আশীর্বাদ, উপমান - নমস্কার । এখানেও উপমানই প্রধান বক্তব্য রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই এটি অপহ্নুতি। আর একটি উদাহরণ -

নারী নহ, কাব্য তুমি, তোমা' পরে কবির প্রসাদ

কবির কল্পনা মোহে - চক্ষে তব ঘনায়েছে ঘোর। -বুদ্ধদেব বসু

নারী উপমেয়, কাব্য - উপমান। 'নহ' শব্দ দিয়ে উপমেয় অস্বীকৃত। আবার -

'এ তো মালা নয়গো, এ যে তোমার তরবারি।' -রবীন্দ্রনাথ

এখানে মালা উপমেয়, তরবারি - উপমান। নয়গো শব্দ ব্যবহারে উপমেয় অস্বীকৃত।

ব্যতিরেক :

ব্যতিরেক শব্দের অর্থ অতিক্রান্তি বা অতিরেক। একটি বস্তু যদি কোন বিষয়ে অপর বস্তুকে ছাড়িয়ে যায়, তখন বলা যায় অতিক্রান্তি ঘটেছে। এদিক থেকে একটি বিশেষ ধরণের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সাদৃশ্যমূলক অলংকারের নাম ব্যতিরেক। এর সংজ্ঞা -

যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমেয়কে উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হিসেবে দেখানো হয়, তাকে বভাতিরেক অলংকার বলে। যেমন -

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।

-জীবনানন্দ

এখানে উপমেয় 'বাংলার মুখ'কে উপমান 'পৃথিবীর রূপ' এর তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেখানো হয়েছে। তাই এটি ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে। বা -

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ নারীকণ্ঠের কাকলি। -রবীন্দ্রনাথ

এখানে উপমেয় - নারী কণ্ঠের কাকলি, উপমান কলকল্লোল। এখানে বলা হয়েছে কলকল্লোলকে (হৈ-হট্টগোল) লজ্জা দিল আজ নারীকণ্ঠের কাকলি (অর্থাৎ হৈ হট্টগোলের চেয়েও নিন্দনীয়) । তাই এখানে উপমেয়কে উপমান অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা অপকর্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাই ব্যতিরেক অলংকার হল।

ব্যতিরেকের শ্রেণিবিভাগ :

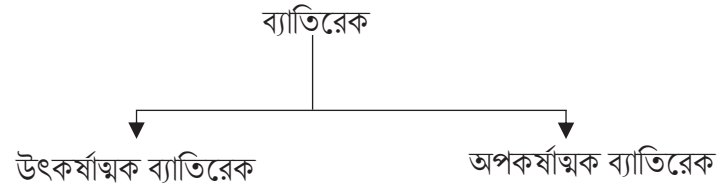

উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক :

যে ব্যতিকরেক অলংকারে উপমেয় উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচ্য হয় । তা উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক। যেমন -

তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো। -রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় 'দিঠি' (দৃষ্টি), উপমান 'মেঘ' । দিঠি মেঘের চেয়ে কালো । দৃষ্টির ক্ষেত্রে 'কালো' উৎকর্ষবাচক। বা -

কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জা হত। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এখানে কণ্ঠস্বরের (উপামেয়) গাম্ভীর্যের কাছে বজ্র (উপমান্য) লজ্জিত । অর্থাৎ উপামেয়র উৎকর্ষতা দেখানো হয়েছে।

অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক :

যে ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়কে উপমানের চেয়ে নিকৃষ্ট (অপকর্ষ) হিসেবে দেখানো হয়, তাকে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার বলে। যেমন -

এ পুরীর মাঝখানে যত আছে শিলা,

কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর। -রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় 'শ্যামা' উপমান 'শিলা'। শ্যামা শীলার চেয়ে কঠিন - এ কথায় উপমেয়র অপকর্ষই প্রকট। কারণ, কাঠিন্য (নিষ্ঠুরতা) দোষ বিশেষ। বা -

খঞ্জন খঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল; শোভে' -বংশীবদন

টিপ্পনী

অতিশয়োক্তি :

যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করে নেয়, অর্থাৎ উপমেয়র পরিবর্তে উপমানই বর্ণিত হয়, উপমেয়র উল্লেখ হয় না, তাকে অতিশয়োক্তি বলে। যেমন -

মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ অনলে আজ,

ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন গর্জিলা দুমরাজ। -রবীন্দ্রনাথ

এখানে উপমান - 'পতঙ্গপাল' , উপমেয় -'সৈনিকবৃন্দ উহ্য'। উপমেয়র সঙ্গে উপমানের অভেদ্যত্বের জন্য উপমান পতঙ্গপাল উপমেয় সৈনিকবৃন্দকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং উপমান পতঙ্গপালের সর্বেসর্বারূপে প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অতিশয়োক্তি অলংকার হয়েছে।

অতিশয়োক্তি অলংকারের শ্রেণিবিভাগ :

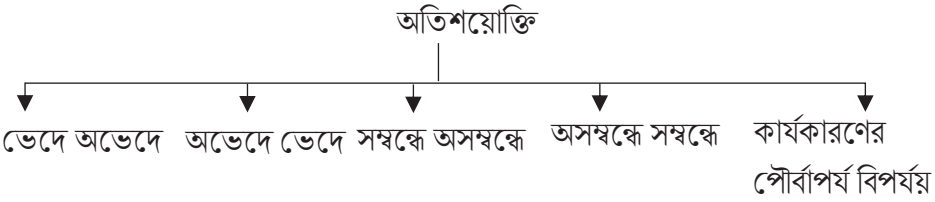

ভেদে অভেদ অতিশয়োক্তি বা রূপকতিশয়োক্তি :

যে অতিশয়োক্তি অলংকারে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুতে অভেদ কল্পিত হয় এবং উপমেয়কে উপমান সম্পূর্ণ গ্রাস করে উপমানই প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে ভেদে অভেদ অতিশয়োক্তি বলে। যেমন -

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়

তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়। -সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপমান -সাগরে থাকা অগ্নি, উপমেয় - বিদ্যাসাগর (উহ্য)। উপমান ও উপমেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এখানে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করেছে। তাই ভেদে - অভেদ অতিশয়োক্তি হয়েছে এখানে।

টিপ্পনী

অভেদ ভেদ অতিশয়োক্তি :

এই অলংকারে একই বস্তুকে কল্পনায় দুই পৃথক বস্তু (উপমেয় ও উপমান) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

'মা আমার বড়ো বেশি মায়ের মতন।' -জ্যোৎস্না কর্মকার

এখানে একই 'মা' এর মধ্যে কল্পনায় দুই 'মা' এর উপস্থাপনে বাক্যটিতে অভেদে ভেদ অতিশয়োক্তি হয়েছে।

সম্বন্ধে অম্বন্ধ অতিশয়োক্তি :

যে অতিশয়োক্তি অলংকারে চির সম্বন্ধযুক্ত দুটি বস্তুকে কল্পনায় সম্বন্ধহীন হিসেবে দেখানো হয়, তাকে সম্বন্ধে অসম্বন্ধ অতিশয়োক্তি বলে। যেমন -

'আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান
কেবল সরমখানি রেখেছি।' -রবীন্দ্রনাথ

হৃদয়, প্রাণ ও সরম অবিচ্ছেদ্য, চিরসম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু এখানে সরমকে কল্পনায় পৃথক করা হয়েছে। এই হিসেবে এটি সম্বন্ধে অসম্বন্ধ অতিশয়োক্তি অলংকার।

অসম্বন্ধে সম্বন্ধ অতিশয়োক্তি :

এখানে সম্বন্ধহীন দুটি বস্তুর মধ্যে গভীর সম্বন্ধ কল্পনা করা হব। যেমন -

আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা.
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা। -রবীন্দ্রনাথ

কবি এখানে সন্ধ্যাতার ও কাননের ফুলের অসম্বন্ধে কল্পনায় সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। ফলে এখানে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ অতিশয়োক্তি হয়েছে।

কার্যকরণের পৌর্বাপর্য বিপর্যয় অতিশয়োক্তি :

এখানে কারণের আগেই কার্য ঘটে। অর্থাৎ আগে কার্য, পরে কারণের বিন্যাস ঘটে। যেমন -

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
গোলাপকে বললুম সুন্দর
সুন্দর হল সে।' -রবীন্দ্রনাথ

পান্না এমনিতেই সবুজ, চুনি রাঙা, গোলাপ সুন্দর। এগুলিকে দেখেই বলা যায় - পান্না সবুজ, চুনি রাঙা, গোলাপ সুন্দর। কিন্তু কবি বলেছেন ঠিক বিপরীত কথা। তাঁরই চেতনার রং নিয়ে পান্না সবুজ, চুনি রাঙা; তাঁরই কথা মতো নাকি গোলাপ সুন্দর হয়েছে। এখানে কার্য কারণ

বিপর্যয় দেখা গেছে, কিম্বা -

'হরিণনয়না সুন্দরী যবে আকুলিত হ'ল মনে,

বকুল রসাল ফোটেনি তখনও পৃথিবীর বনে বনে।

বকুল রসালের ফুল ফুটলে অর্থাৎ বসন্তকালে এলে (কারণ) হরিণনয়না সুন্দরীরা আকুলিত হয় (কার্য)। কিন্তু বসন্ত আসার আগেই তারা আকুলিত হয়েছে অর্থাৎ কারণের আগেই কার্য ঘটেছে।

টিপ্পনী

সমাসোক্তি :

সমাসোক্তি = সমাস + উক্তি। 'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপ। সমাসোক্তি কথাটির আক্ষরিক অর্থ তাই। সংক্ষিপ্ত উক্তি। এর সংজ্ঞায় বলা যায় -

যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারে উপমেয়র ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হয়, কিন্তু উপমানের উল্লেখ থাকে না, তাকে সমাসোক্তি অলংকার বলে। যেমন -

'শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই,

'আয়, আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই। -নজরুল

'আয়, আয়' বলে কাঁদা মানুষের ধর্ম (উপমান) এবং সেই ধর্ম সানাইতে (উপমেয়) আরোপিত। সানাইয়ের উপর মানুষের ধর্ম আরোপিত হওয়ায় এখানে সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে। বা -

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার - আঁচল - খসা,

হাতে দীপশিখা। -রবীন্দ্রনাথ

সন্ধ্যার (উপমেয়) উপর তন্দ্রালসা। বিস্রস্ত - অঞ্চলা ও দীপশিখাধারিণী বধূর (উপমান) ব্যবহার আরোপিত হয়েছে। কতগুলি বিশেষণ থেকে বধূর ব্যবহার বোঝা যায়।

বিরোধমূলক অর্থালংকার :

দুটি বস্তুর আপাত বিরোধকে অবলম্বন করে যে প্রকৃতির অলংকার গড়ে ওঠে, তাকে বিরোধমূলক অর্থালংকার বলে। যেমন -

'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ। -রবীন্দ্রনাথ

এই কথাটি আপাত বিরোধমূলকক। অসংখ্য বন্ধনেদর মধ্যে মুক্তির স্বাদ নেওয়া অর্থাৎ মানুষ -মানুএ ভালবাসার বন্ধন। এবন্ধন শৃঙ্খল নয়। মুক্তি। তআই আপাত ভাবে বিরোধ থাকলেও এটি বিরোধমূলক অলংকার।

টিপ্পনী

বিরোধমূলক অলংকারের শ্রেনীবিভাগ :

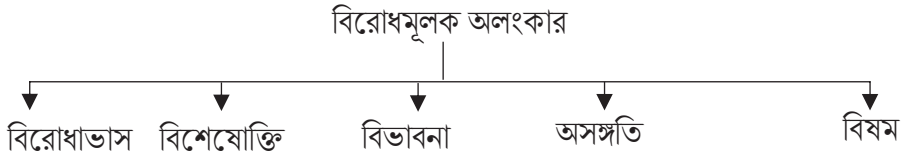

আমাদের আলোচ্য শুধুমাত্র বিরোধাভাস অলংকার।

বিরোধাভাস :

যেখানে দুটি বস্তুতে বা বিষয়ে আপাত বিরোধ থাকে, কিন্তু প্রকৃত বিরোধ থাকে না তাকে বিরোধাভাস অলংকার বলে। 'আভাস' মানে 'মনে হচ্ছে আছে কিন্তু নেই'। যেমন -

যদি বড় হতে চাও
ছোট হ্ও তবে। -ঈশ্বরগুপ্ত।

বড় হতে গেলে ছোট হতে হবে - এই কথাটি আপাত বিরোধমূলক বলে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে বড় বা মহান হতে হলে ছোট অর্থাৎ নম্র ও বিনয়ী হওয়া দরকার। তাই দেখা যাচ্ছে এখানে প্রকৃত কোন বিরোধ নেই। যেন একটা বিরোধের আভাস আছে। তাই এটি বিরোধাভাস। বা -

'আমাদের এই মানুষের সমাজে, দেবতার চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ মানুষ।' - বিনয় ঘোষ

মানুষের সমাজে মানুষ দুর্লভ - একথা পরস্পর বিরোধী। কিন্তু মানুষের সমাজে মানুষের মতো মানুষ (মহৎ মানুষ) সত্যিই দুর্লভ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তাৎপর্যগত দিক থেকে এ উক্তিতে কোন বিরোধ নেই। তাই এটি বিরোধাভাস অলংকার। কিম্বা -

আর, আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই। -রবীন্দ্রনাথ

চেনা অথচ লক্ষ্য না করা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু এখানে লক্ষ্য না করার অর্থ এড়িয়ে যাওয়া কিংবা পরিচয় ধরা না দেওয়া। তাই চরিত্রের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আপাত বিরোধ এ উক্তিতে থাকলেও প্রকৃত বিরোধ নেই।

গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলংকার :

যে অলংকারে বাক্যের একটি গূঢ় বা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে এবং সেই অর্থ অন্য একটি বাচ্যার্থের আড়ালে থাকে, তাকে বলে গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার। যেমন -

'কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তা' বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে মানুষের শোভা পায়? - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এই বাক্যের একটি গূঢ় অর্থ আছে। তা হল খারাপ লোক যা করতে পারে সভ্য ও সৎ মানুষের তা করা উচিত নয়। তাই এটি গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলংকার।

গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলংকারের শ্রেণীবিভাগ :

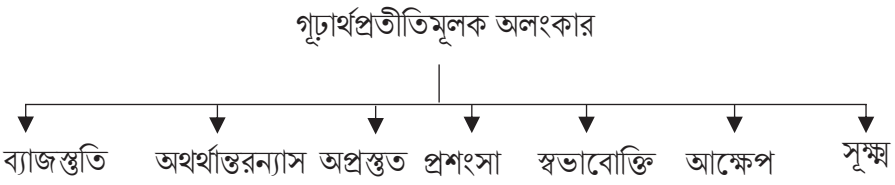

আমাদের এই ছটি ভাগের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথমভাগ ব্যাজস্তুতি অলংকার আলোচ্য।

ব্যাজস্তুতি :

'ব্যাজ' শব্দের অর্থ কপট বা ছল। সুতরাং 'ব্যাজস্তুতি'র অর্থ কপটস্তুতি। অর্থাৎ উপরে উপরে স্তুতি, আসলে স্তুতি নয়। গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক এই অলংকারের সংজ্ঞা এই অর্থেরই কিছুটা বিস্তার আছে মাত্র। এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে নিন্দার ছলে স্তুতি কিম্বা স্তুতির ছলে নিন্দা করা হলে তাকে ব্যাজস্তুতি অলংকার বলে। যেমন -

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ। -মধুসূদন

এই উক্তি রাবণের। লঙ্কাপুরীর চারিদিকের সমুদ্রকে দেখে এই সম্বোধন করেছে রাবণ। অবন্ধনা সিন্ধু আজ রামচন্দ্রের দ্বারা সবন্ধনা হয়েছে। অর্থাৎ রামচন্দ্র অলঙ্ঘ্য অজেয় সমুদ্রের সেতুবন্ধনে সক্ষম হয়েছে। রাবণ তাই সমুদ্রকে ধিক্কার দিয়েছে। তার এই উক্তি আসলে নিন্দামূলক। 'সুন্দর মালা'র গূঢ়ার্থ হল 'কুৎসিত ফাঁস'। তাই এটি ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়েছে। আবার -

'অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুণ।।' -ভারতচন্দ্র

শিব সম্পর্কে অণ্নপূর্ণা দুর্গার এই নিন্দাবাদ আসলে প্রকৃতপক্ষা নিন্দার ছলে স্তুতি। অন্নপূর্ণা বলেছেন তার স্বামী শিব দেবজ্যেষ্ঠ, তিনি মুক্তিসাধনায় সর্বোত্তম। তিনি নির্গুণ, কপালে তার (তৃতীয় নয়ন) আগুন। আবার -

বন্ধু ! তোমরা দিলে নাকো দাম
রাজ-সরকার রেখেছেন মান।
যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন ! -নজরুল

এখানে আছে স্তুতির ছলে নিন্দা।

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী

১. অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি - এই শব্দালংকার সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ব্যাজস্তুতি, অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি, সমাসোক্তি, ব্যাতিরেক, বিরোধ, নিশ্চয়, সন্দেহ - এই অর্থালংকার গুলো সম্পর্কে আলোচনা করো।

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

সঞ্চিতা - কাজী নজরুল ইসলাম (নির্বাচিত কবিতা)

টিপ্পনী

সন্ধিক্ষণের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯১ - ১৯৭৬) । নজরুল বাংলা সাহিত্যে আকস্মিকভাবেই এসেছিলেন । কিন্তু গীতিকার, সুরকার , নাট্যকার উদীপ্ত প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বাঙালীর হৃদয়কে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল । নজরুলের জীবনমুখী বিশেষ কবিদৃষ্টি বাংলা কবিতায় এক পালাবদলের সূচনা করল । আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বিদ্রোহে পরাধীনতার শিকল ছেঁড়া যে কাব্য রচনা করলেন তাতে সাধারণ পাঠক অনায়াসেই নিজেদের কবিকে খুঁজে পেলেন।

নজরুলের অভিজ্ঞতার ভান্ডার ছিল পরিপূর্ণ । তাঁর আবাল্য সঙ্গী দারিদ্রতা,কৈশোরের পিতৃহীনতা এবং লেটোগানের আসরে তাৎক্ষণিক ছড়া তৈরীর অভিজ্ঞতা নজরুলকে একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে সৃষ্টিশক্তির স্বাদ যুগিয়েছিল । যৌবণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি আরো প্রশস্ত হল । যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর আমাদের সামাজিক অনাচার, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের শোষণের জ্বালা তার কবিচিত্তে প্রভাব ফেললো । অতঃপর যে কবিতা তিনি রচনা করলেন তাতে ভারতবাসীর যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথা বাণীরূপ পেল । এই উদ্দীপণাময় কবিতার স্পর্শে স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গে উদ্বিগ্ন বাঙালীহৃদয় ইংরেজ শাসনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রোহের মনোভাবকে প্রতিধ্বনিত হতে দেখলো।

নজরুলের কবিতায় বিশেষ বিষয়ভাবনা ও রূপশৈলীকে কয়েকটি সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে । এগুলি তাঁর সম্পর্কে চরমসূত্র না হলেও এর সাহায্যে কবি প্রকৃতির স্বরূপটিকে আমরা ধরবার চেষ্টা করতে পারি।

এক - সামাজিক অসাম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাঁর অবসানের ভাবনা।

দুই - সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধতা - হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কামনা।

তিন - বিদেশী শাসন ও শোষণের যন্ত্রণা - স্বরূপ উন্মোচন ও তার প্রতিবাদ।

চার - ধর্মীয় অনাচার ও প্রথাগতত ধর্মীয় আচারের প্রতি অনাস্থা।

পাঁচ - জড়তাকে আঘাত করে সচল যৌবনের বর্ণনা।

টিপ্পনী

ছয় - প্রেম প্রকৃতির আবেগ মন্ডিত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী।

সাত - বিদ্রোহী সত্তার আড়ালে একটি ভক্তিরসের আকুতি খুঁজে ফিরছিল - শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান তার প্রমাণ।

আট - নতুনগীত শাখা ও গায়কী পদ্ধতীর উদ্ভব - পারস্যের গজল গানের প্রভাব।

নয় - সাবলীল ছন্দের দ্যোতনা।

দশ - বীরত্বধর্মী ও মানবতাবাদী কবিতার মধ্যে মার্কিনী কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো বলিষ্ট প্রকাশভঙ্গি।

এগার - বাংলা কাব্যের শব্দ ভান্ডারে নতুন আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দের সংযোজন।

নজরুলের স্বল্পায়তন কবিজীবনের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিবর্তন রেখা লক্ষ্য করি ল প্রথম জীবনের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী রূপ পরবর্তী প্রেম ও সৌন্দর্যে আত্মমগ্ন হয়েছে। জণগণের আত্মজিজ্ঞাসাকে অনুভব ও রূপায়ন করার ক্ষমতা নজরুলের কাব্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাই সমাজ ও সামাজিক মানুষের অর্ন্তদাহকে নজরুল তাঁর কবিতায় বিস্ফোরিত করতে চেয়েছিলেন।

নজরুলের বিদ্রোহ শুধুমাত্র বাঙালী সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধেই নয়। বিদেশি শোষকের বিরুদ্ধেও। সাম্রাজ্যবাদীর নির্লজ্জ শোষণে নিঃস্ব, হতমান ভারতীয়দের নতুন রীতির স্বাধীনতার বন্দনা গান তিনি গেয়েছেন -

‘কারার ঐ লৌহ কপাট

ভেঙে ফেল কররে লোপাট

রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণভেদী।”

যে ধর্মীয় কুসংস্কার ভারতবাসীকে অন্ধকারের অতলে নিক্ষেপ করেছিল, নজরুল তার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। কুসংস্কারের উৎসমূলে তিনি কিছু ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর ধর্মান্ধতা ও ব্যবসা বুদ্ধিকে দেখেছেন। তাঁর রচনাবলীতে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে দেখা যায়।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
68

কাজীর সময়কালে ব্রিটিশ শাসন ও তার সমর্থনকারীদের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলিম শত্রু এমন ধারণা প্রবল হয়েছিল। এ আর কিছু নয়, স্বাধীনতাকামী মানুষকে বিপথগামী করার এক সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। উগ্র সম্প্রদায়িকতা এখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভেদ অনৈক্যের ফাটল তৈরী করেছিল। কবি তাই দেশনায়ককে সচেতন করেন -

“হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?

কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।”

পাশাপাশি অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে ধনী দরিদ্রের ভেদ নজরুলের কাছে ঘৃন্য বলে অনুভূত হয়েছে। সাম্যবাদী কবিতার উনিশ শতকীয় এবং বিশ শতকের প্রথমের বিষয়ভাবনা দুর্লক্ষ্য না হলেও সিন্ধু হিন্দোল কাব্যের দারিদ্র্য কবিতায় কবি একেবারে স্বতন্ত্র বিষয়চারিতা দেখিয়েছেন। ছন্দবানী ভঙ্গীতে কখনও মধুসূদন কখনও রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহায্য করলেও বিষয়ের অভিনব ভাবনা শেষ অবধি নজরুলের বিশেষত্বকে চিহ্নিত করে। দারিদ্র্য এখানে দেবতাদর্পী তাপসের মতো। আবার ঘরের কোনে সেই দেবতার ছায়া দেখেন। ক্ষুধিত পুত্রের মুখে, ক্ষুধার্ত জায়ার মুখে এখানে নিত্য অভাবী মানুষের বুকফাটা ক্রন্দন অসামান্য ছন্দের সচল প্রভাবে পাঠক মনে বেদনার ঋর্ণাকে উন্মুক্ত করে দেয়। কবি মনে করেন দারিদ্র তাকে মহৎ করেছে। এই মহত্ত্ব যীশুর কন্টক মুকুট আভরণ। অভাব বোধ তাকে অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস জুগিয়েছে। আট ছয় এই মাত্রা বিন্যাসে একটি গভীর ধ্বনি কবিতাটিকে ধ্বনিত করেছে। অথচ কবি পেলেন না সে তার রূপ ; রস প্রাণকে অকালেই শুষ্ক করার জন্য এই দেবতাই দায়ী। তবু সুন্দরের উপহার তিনি নিতে চান, কিন্তু অভাববোধ তা অনুভব করার আগে গ্রাস করে নেয় কল্পনার শ্যামলতার মরুভূমির ধূসরতা জাগিয়ে চোখে এই সৌন্দর্য পিপাসার বদলে অগ্নিবান দেখা দেয়। দরিদ্র কাঠুরিয়ার মতো কামনার বৃক্ষকে ভেঙে ফেলে। করুণ হৃদয়ের কোমলতা তার প্রচন্ড প্রতাপে মিলিয়ে যায়। সুন্দরের কল্যাণের স্বপ্ন এভাবেই জানিয়েছেন অমৃতে কি ফল ?

"জ্বালা নাই, নেশাপাই, নাই উন্মাদনা
রে দুর্বল, অমর আর অমৃত সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে।"

দুঃখের কালিদহে অভাবী মানুষের জন্ম, কাঁটা কুঞ্জ তার মালিকা। সমাজে দীর্ঘকাল ধরে সে লোকাচার, সংস্কার, চিন্তার, স্থবিরতা জীর্ণতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তার বিরুদ্ধেও কবি মুখ খুলেছেন, যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তারুণ্যের প্রাণ শক্তির যে প্রশস্তি মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তারই সার্থক উত্তরসুরী নজরুলের যৌবন বন্দনার কবিতাগুলি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটির কথা মনে পড়ে।

নজরুল সমাজদ্রোহী বটে কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহী ছিলেন না। তিনি সচেতন ভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার না করলেও তার স্বভাবের জোর বাংলা কবিতার নতুন রঙের সঞ্চার করেছিল। বুদ্ধদেব বসু সফলভাবে আবিষ্কার করেছেন যে -

"নজরুলের কবিতায় যে পরিমাণ উত্তেজনা
ছিল সে পরিমাণ পুষ্টি যদিও ছিলনা, তবু
অন্ততঃ নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়ে ছিলেন।
..... এটুকুই তিনি দেখিয়েছিলেন যে

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়া অন্যপথ বাংলা কবিতায়
সম্ভব।"

সাম্যবাদী নজরুল / মানবতাবাদী নজরুল সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের নিরীখে :

টিপ্পনী

সাম্যবাদী নজরুল কিংবা মানবতাবাদী নজরুল সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গ ক্রমে মার্কসীয় সাম্যবাদের কথা চলে আসে। প্রথমেই জানিয়ে রাখা যেতে পারে নজরুলের সাম্যবাদ ও মার্কসের সাম্যবাদ সম্পূর্ণ রূপে বিজাতীয়। বিষয়টি স্পষ্ট করবার জন্য প্রথমেই মার্কসীয় সাম্যবাদ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

(ক) মার্কসীয় সাম্যবাদের ভিত্তি অর্থনীতি, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা কায়েম করাই এর লক্ষ্য।

(খ) শ্রেণি সংঘর্ষই বিপ্লবের পথ।

(গ) শ্রমিক শ্রেণীর একনায়ক তন্ত্রের মাধ্যমে শ্রেণি বিলুপ্ত দুনিয়াজোড়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই মার্কসবাদের লক্ষ্য। মার্কসবাদ পুঁজি-পুঁজির চূড়ান্ত রূপ সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির চিরকালীন উচ্ছেদের একমাত্র উপায়।

(ঘ) মার্কসবাদ ধর্মের প্রয়োজন স্বীকার করে না। কেনণা ধর্ম শোষক শ্রেণীর সৃষ্ট সাধারণ মানুষকে ঠকানোর একটি শক্তিশালী কৌশল। মার্কসবাদ তার বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে শ্রেণী সচেতন করে তোলে।

(ঙ) মার্কসবাদ হল বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ।

(চ) মার্কসবাদ দাবি করে যে মার্কসবাদই সাম্যবাদ, মার্কসবাদ ছাড়া যে কোন সাম্যবাদ অলীক, কুহেলিকাময় এবং বাস্তবে অপ্রযোজ্য।

মার্কসবাদের উপরিক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে নজরুলকে সাম্যবাদী বলা যায় না। কেননা মার্কসীয় সাম্যবাদ বস্তুবাদী কিন্তু নজরুল বস্তুবাদী নয়, তিনি ভাববাদী। তিনি পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, বিধি ভবিতব্য, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর কল্যাণকারী মহিমা ইত্যাদি বিষয়ে পুরোপুরি আস্থাশীল। তাঁর অনশন ক্লিষ্ট ভিক্ষুক যেমন অনুযোগ করে -

"আশীটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু !" [মানুষ]

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
70

আবার মেহনতি মানুষের মহাউত্থান; যাকে কবি আপন আবেগ বিশ্বাসে অনিবার্য মনে করতেন, তার পেছনে আসলে তিনি ঈশ্বরের নিগূঢ় অভিলাষকেই অনুভব করেন।

"মহামানবের মহা - বেদনার আজি মহা - উত্থান

উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।" [কুলিমজুর]

তাঁর কবিতায় মিথোলজি তথা পুরাণ প্রসঙ্গের এত ভিড়ের কারণই হল তার ধর্ম চেতনা পুষ্ট মানসিকতা। তবে একটা জিনিস অতি স্পষ্ট যে ধর্মের নামে গোঁড়ামি এবং আচরণ বাদকে কখনোই তিনি স্বীকার করেন নি। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং অন্ধ আচরণবাদের বিরুদ্ধে তিনি চিরকালই ব্রজকণ্ঠ -

"খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালে?

সবদ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!" [মানুষ]

তবে নজরুলের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না ঠিকই কিন্তু সংস্কারমুক্ত ধর্ম সম্পর্কে, ধর্মের শুদ্ধাচার সম্পর্কে একটা সমর্থন ছিল। পরবর্তীকালে তার স্ত্রী প্রমিলা দেবীর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবার পর ধর্মীয় কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের কাছে হাস্যকর আত্মসমর্পণও করেছিলেন। এই ধর্মবিশ্বাস কবি চেতনায় ঝুলিয়ে দিয়েছে সীমার পর্দা। তার ফলেই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেই নজরুলের ধারণা মার্কসবাদের মতো যুক্তি নির্ভর ও স্পষ্ট হতে পারে নি।

অন্যদিকে শ্রেণীচেতনা সম্পর্কেও নজরুলের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। অথচ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। -

"তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুঠে ও কুলি

তোমারে বহিতে হারা পবিত্র অঙ্গে লাগল ধূলি,

তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান,

তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

তুমি শুয়ে রবে তেতলার পরে, আমরা রহিব নীচে,

অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।" [কুলিমজুর]

এই উদ্ধৃতাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে নজরুল - মানসে শ্রেণী চেতনা সংগঠিত হয়ে উঠেছিল ঠিকই তবে তা যথেষ্ট বস্তুবাদী বা ধর্মীয় ভাবালুতা মুক্ত হতে পারে নি। 'পবিত্র অঙ্গ' পদবন্ধে ওই ভাবালুতাই প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু মানুষকে দেবতা কল্পনা করায় প্রকাশিত হচ্ছে ধর্মীয় আবেগের কোটি চাপ।

আবার মার্কস কথিত শ্রেণী শোষণের ইতিহাস নজরুলের চিন্তালোকে অস্পষ্ট রূপে হলেও প্রকাশিত। 'কান্ডারী হুশিয়ার' কবিতায় তাঁকে তাই 'যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যাথা', বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান' এর কথা বলতে কিংবা তাদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করতে দেখা গেছে। কিন্তু মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী পুঁজির উদ্ভবের থেকেই শ্রেণী শোষণের উৎপত্তি এবং এই শোষণ প্রথমত ও প্রধাণত অর্থনৈতিক, নজরুল তা অনুধাবন করতে পারেন নি, এই ব্যাপারে তাঁর চিন্তা মার্কসবাদ থেকে আলোকপ্রাপ্তও হয় নি।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তবে সবমিলিয়ে বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশিত নজরুলের সাম্যবাদী আবেগের বৈশিষ্ট্যগুলি এবারে পরপর উল্লেখ করা যাচ্ছে -

(ক) কবি মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। ভাষা ধর্মাচার ইত্যাদি বাহ্য ভিন্নতা তুচ্ছ করে তিনি গুরুত্ব দেন মানুষের হৃদয়কে। কারণ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নেই।

(খ) মোল্লা -মৌলবি -পুরোহিত আর সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন বৈষম্য নজরুল স্বীকার করেন নি। কারণ মোল্লা-পুরোহিতরা 'খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী' তো নয়।

(গ) পাপী ও পুণ্যবাণের মধ্যেও কোন বৈষম্য স্বীকার করেন না কবি। বারাঙ্গণাকেও তিনি মাতার সম্মান দিতে চান ; স্বর্গ দেবতার পাপে টলমল। পাপ করেনি এমন নারী পুরুষ মর্ত্যে নেই, সুতরাং পাপী বলে, বারাঙ্গনা বলে কাউকে ঘৃণা করা অনুচিত।

(ঘ) নারী ও পুরুষ উভয়কেই কবি সমান বলে মনে করেছেন। কারণ বিশ্বের যা কিছু মহান, কল্যাণময় অথবা যা কিছু পাপ, বেদনা, অশুভ 'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'।

(ঙ) ধনী এবং কুলিমজুরদের মধ্যে কবি সাম্য কামনা করেন, বিশ্বাস করেন শ্রমিক উত্থানের শুভদিন সমাগত।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমাণ করে যে নজরুলেদর সাম্যবাদ কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্ক বা বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে নয়, আর এরই ফলে তিনি একে সমকালের আর্থসমাজিক অবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, চান নি। তবে তাঁর সাম্যবাদ মূলত আবেগসঞ্জাত। নজরুল মূলত মানব প্রেমিক, তিনি সমাজের উঁচুতলার কোন পরিবার থেকে কাব্যের আসনে এসে উপস্থিত হননি। ঈশ্বরগুপ্তের মতে, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্রের মতো অত্যন্ত নীচুতলা থেকে উঠে এসেছেন। সেজন্য তিনি দরিদ্র ক্লিষ্ট, দুঃখ জীর্ণ অসংখ্য মানুষকে অতিকাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সেজন্য তার কাছে তত্ত্ব কথার চেয়ে জীবনের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরনোই ছিল প্রধান বিষয়। সে কারণেই তার মধ্যে যুক্তি বুদ্ধির প্রকাশ যতটা হয়েছিল তার চেয়ে আবেগের প্রকাশ ছিল অনেক বেশী। তবে একথাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাপক সংখ্যক জনগণের মধ্যে সাম্যবাদী আবেগের উদ্বোধন ঘটিয়ে মার্কসীয় সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাভূমি প্রস্তুত করে দিয়ে ছিলেন নজরুল। এদিক থেকে তাঁকে বাংলার সাম্যবাদী আন্দোলনের - সাম্যবাদী সাহিত্যের অগ্রদূতের সম্মান দেওয়া যায়।

মানুষ :

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

কবিতা হল 'মানুষ'। নজরুলের কবিসত্তার মূলে ছিল মানবপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেম, মানুষ ও দেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। আর সেই ভালোবাসার উৎস থেকেই 'মানুষ' কবিতাটি রচিত। কবিতাটিতে তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন, তাই শুরুতে বলেছেন -

"গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!"

'সর্বহারা'য় এসে তিনি সাম্যবাদের কথা প্রচার করেছেন, যে সর্বহারা শ্রেণি কবিকে বিপ্লবধর্মে দীক্ষা দেয়, সাম্যের গান গাইতে তাকে প্রেরণা যোগায়, তার পেছনে নেই কোন ঐতিহাসিক চেতনা, নেই কোন শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্য তাগিদ। আছে কেবল মানবিক প্রীতি।

তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি কবিতাটিতে জানিয়েছেন আমাদের আলাদা করে কোন জাত নেই; নেই কোন ভেদাভেদ আমরা সবাই মানুষ। তিনি বলেছেন ভগবান আছেন মানুষের অন্তরে, সমস্ত কালে সমস্ত দেশের সব মানুষের মধ্যেই তিনি বিদ্যমান। অতএব কোন মন্দির কিংবা মসজিদে নেই দেবতাকে আলাদা করে খুঁজতে যাওয়ার কোন মানে হয় না - কবির এই সাম্যবাদ সমাজ জীবনের প্রতি আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তবুও সমাজে যে সমস্ত ভন্ডরা রয়েছে তারা যে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের জাতের প্রাচীর তুলেছে তাই কবি এখানে দেখিয়েছেন। এক অভুক্ত পথিক যে সাতদিন কিছু খায়নি সেই পথিক এসেছে মন্দিরে, ভেবেছিলো এখানে খাবার পাওয়া যাবে কিন্তু হায়! ভন্ড পূজারী ভাবলো -

'কিন্তু সে দেবতার বরে আজ রাজাটাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়' ভন্ড পূজারী যখন দেখলো মন্দিরে এক ভিখারী দাঁড়িয়ে আছে দুটি খাবারের জন্য যে তাকে দূর করে দিল। কবির প্রতিবাদ উপচে পড়েছে এদের বিরুদ্ধে। পাপী বলে কাউকে ঘৃণা করার অধিকার আমাদের নেই। এই নিপীড়িত, উপদ্রুত মানুষের জন্য নজরুলের কবি কণ্ঠে আমরা যেন প্রচারকের সুর শুনতে পাই।

মন্দির মসজিদ সবার জন্য যেখানে নির্দিষ্ট কোন বেড়াজাল দিয়ে সীমা তৈরির অধিকার কারও নেই, সেখানেও ভুখারী বিতাড়িত সেই সঙ্গে লাঞ্ছিত। এদের মত মানুষের মুখ দিয়ে কবি যেন নিজের জবানিতেই বলিয়েছেন -

"ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা তোমার নয়!'

বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠে নজরুল 'মানুষ' এর মত কবিতা রচণার ব্রতি হলেন। এর মূলে আছে গভীর মানব প্রেম ও মানবিকগুণসম্পন্ন কবিচিত্ত মানুষের উপর নির্যাতন, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরে এই প্রতিবাদ। এই কবিতায় তিনি অভূতপূর্ব উন্মাদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেখানে দেবতার কাছে মানুষের যাওয়ার জন্য বেড়াজাল দিয়ে গন্ডী দেওয়া হয় সেখানে কবি বলেছেন -

"তব মসজিদে মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তাই কবি চেঙ্গিস, গজনী মামুদ ও কালাপাহাড়দের আহ্বান করেছেন ওই সমস্ত ভজনালয়ের তালা ভেঙে ফেলার জন্য। ভগবানের ঘরে তালা দেবে এমন স্বার্থপর মানুষদের বিরুদ্ধে তিনি মুখ খুলেছেন আর তাই চেঙ্গিস এবং কালাপাহাড়দের তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন -

"খোদার ঘরে কে কপট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা,
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !"

কবি বলেছেন যে মানুষ কোরাণ, বেদ, বাইবেল - এর মত গ্রন্থ এনেছে । সেই মানুষকেই ঘৃণা করে ওই সমস্ত গ্রন্থ যারা পূজা করে তারা ভন্ড ছাড়া কিছুই নয়।

তিনি আরো বলেছেন আদম, দাউদ, ঈশা, মুশা, ইব্রাহিম মোহাম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ - এরা সকলেই বিশ্বের পূজনীয় এদের প্রত্যেকেই মানুষ তাই কোন না কোন ভাবে এদের সবার সঙ্গে আমাদের সবারই সম্পর্ক রয়েছে। আমরা তো তাদেরই জ্ঞাতি, তাই সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়ে কে কখন এদের মত পূজনীয় হয়ে উঠবে তা কী বলা যায়। তাই কখনই কোন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা, মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে ঘৃণা করা অণ্যায়, পাপ। কারণ কৃষ্ণ, কবীর , বুদ্ধ, নানকদের মত পূজনীয় কোন সত্তা আমার তোমার কিংবা সমস্ত মানবজাতির মধ্যে লীন হয়ে আছে কে জানে ! তাই কবি বলেছেন -

"কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা ?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি ?
হয়তো উহারি বুকে ভগবান জাগিছেন দিবা-রাতি !"

কবি বলেছেন শ্মশানের চন্ডাল ঘৃণ্য নয়, সেওতো মানুষ। যে রক্ত আমাদের শিরা-ধমণীতে রয়েছে সেই একই রক্ত তারও শিরা ধমণীতে বইছে। আজ যাকে তুচ্ছ ঘৃণ্য জীব রূপে দেখছি কাল সেই মহাযোগী সম্রাট হবে উঠবে। রাখাল বলে যাকে ঘৃণা করছি হয়তো তারই মধ্যে ব্রজের গোপাল রয়েছে। আর চাষা বলে যাকে তুচ্ছ করছি হয়তো বলরাম এসেছে চাষা সেজে। আর দ্বারে গালি খেয়ে যে ভিখারী ও ভিখারিণী ফিরে গেলো তারা তো ভোলানাথ ও গিরিরাজেরই রূপ তারা যে লাঞ্ছিত হয়ে ফিউরে গেল তারা কী সেই পাপীকে ক্ষমা করেছে ?

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
74

ভন্ডদের দুচোখেই স্বার্থঠুলি ও লোক ভর্তি না হলে তারা দেখতো ওই সমস্ত মানুষ যারা তাদের সেবায়, মানুষের সেবায় কুলি হয়েছে ভগবান তাদের মধ্যেই বিদ্যমান।

নজরুলের কবিসত্তা ছিল যুগসচেতন। সেই জন্যই তিনি বিদ্রোহী। তাঁর এই বিদ্রোহ অন্যায়, অসাম্য ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও উদার ধর্মমতের পথিক ছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় বার বার উঠে এসেছে সব ধর্মের উপর মনুষ্য ধর্মের

কথা, আর এই 'মানুষ' কবিতায় তারই প্রমাণ মেলে আরো একবার।

ফরিয়াদ :

'ফরিয়াদ' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলাম হুগলীতে বাসকালীন ৭ই আশ্বিন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। পরে কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

টিপ্পনী

ছয় পংক্তি বিশিষ্ট সর্বমোট তেরোটি স্তবকে এই কবিতাটি বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম তিনটি স্তবকে জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির কথা ভেবে কবি বিস্মিত। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে সদাই পরিবর্তন করে চলেছেন। কোন সৃষ্টিই তাকে তৃপ্তিদান করতে পারছেণ না। এই মহাবিশ্ব স্রষ্টার আজ্ঞাবহ। পাশাপাশি কবি স্রষ্টার সাম্যচিন্তার কথাও বলেছেন এই প্রথম তিনটি স্তবকে।

চতুর্থ স্তবক থেকে কবি কণ্ঠে মানব সৃষ্ট জাগতিক বৈষম্যজাত উষ্মা প্রধান হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে মানুষ নানা গাত্রবর্ণের কবি মনে করেন ঈশ্বরের বৈচিত্র্যপিয়াসী সৃষ্টিসাধেই তেমন সম্ভব হয়েছে। অথচ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের নির্যাতন করে সেই মহিমময় ঈশ্বরের অপমান করছে। এই ধরণী যেন ঈশ্বরের কনীষ্ঠ কন্যা, ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন ধূলা মাটি। সেই মাটির ফসলে মানব সন্তানরা প্রতিপালিত। কিন্তু মানব সন্তানেরা নিয়ত একে অপরে হীন হিংস্রতায় লিপ্ত। কবি এই মানব জাতির প্রতি আক্ষেপ করে ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলেছেন -

"তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবী !"

এই নীচ ক্ষমতালোভী শোষকের প্রতি কবির প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই মহাজন, জমিদার, রাজা - এই শোষক শ্রেণীর কথা বলেছেন। এরা ভন্ড, ধড়িবাজ - একথা বলতেও কবি দ্বিধা করেননি। এই শ্রেনির পরিচয় বোধহয় প্রকৃত অর্থে উঠে এসেছে নিম্নোক্ত দুটি পংক্তিতে -

"মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন !"

আজকের দিনেও নজরুলের এ কথা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বরং অনেক বেশি অর্থবহ।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী

অষ্টম স্তবকে কবি জানিয়েছেন, আজ অন্যায় যুদ্ধে যারা যত শক্তিশালী তারা নিজেদের তত বড় বলে আত্মঘোষণা করে, একটি দুর্বল দেশকে সমস্বার্থী পরলোভী প্রবল দেশগুলো একত্রিত হয়ে শোষণ করতে লজ্জিত নয়। আজ বণিকের আস্ফালনের কাছে যেন ঈশ্বরের শুভঙ্কর চক্র পরাজিত। ঈশ্বরের অস্তিতে কবি সন্দিহান নয়, বরং ঈশ্বরের অকারণ নিষ্ক্রিয়তায় কবি বিস্মিত। তিনি লক্ষ্য করেছেন দীর্ঘকালের শোষিত

টিপ্পনী

নির্যাতিত - নিপীড়িত মানুষ আজ মরিয়া হয়ে জেগে উঠেছে। শত শতাব্দীর শোষণে তাদের সব রক্ত শোষিত হয়ে গেছে কিন্তু অবশিষ্ট রয়ে গেছে হাড় - আজ সেই হাড়ের ভিতর থেকে উৎসারিত হয়েছে অদম্য উদ্দীপণা। এই নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত মানুষ তাদের ক্ষুধার অন্নের মধ্যে পেয়েছে তাদের প্রাণের ঘ্রাণ ; তাই সেই অন্ন রক্ষায় লড়াইয়ে আজ তারা বদ্ধ পরিকর। ঈশ্বরের এই বিপুল পৃথিবীকে সকল মানুষ সমানভাবে ভোগ করবে, পৃথিবীর নাড়ীর সঙ্গে সবার সমান সম্পর্ক, কোনো ডাকাতই দুর্বলের গোলা থেকে আর ধান লুঠে নিতে পারবে না।

একাদশ স্তবকে কবি পুনরায় যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ উপস্থিত করেছেন। ঈশ্বরের যে আকাশ থেকে আলো ও বৃষ্টি বর্ষণ হয় সেই আকাশে এই যুদ্ধবাজেরা কৃত্রিম আমোদ বেলুন ওড়ায় আর গোলাগুলি বর্ষন করে। উদার আকাশ বাতাসকে এরা ভীতিকর করে তুলেছে। তাই ঈশ্বরের কাছে নজরুলের যন্ত্রণাময় আর্তি -

"তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কার কামান?
হবেনা সত্য দৈত্য-মুক্ত ? হবেনা প্রতিবিধান ?
ভগবান ! ভগবান !

দ্বাদশ স্তবকে কবি স্বাধীন কর্ম, স্বাধীন বিচরণ, বাক স্বাধীনতা এবং স্বাধীন জীবনধারণের স্বপক্ষে উচ্চকণ্ঠ। নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে কবিও বলেছেন 'মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান - ।' চেতনার মুক্তিই সার্বিক মুক্তির অগ্রদূত। চেতনার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাই হাতের শিকলে টান পড়েছে। অর্থাৎ ভৌত মুক্তির সূচনা হয়েছে। এই চির -নিপীড়িতের দল বুঝতে পেরেছে যে, প্রাণের চেয়ে বহুমূল্যবান হল মুক্তি। কাজেই সংঘবদ্ধ তারা বিশ্বকে স্বাধীনতার তীর্থ বলে উপলব্ধি করে সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়েছে -

"জয় নিপীড়িত প্রাণ !
জয় নব অভিযান !
জয় নব উত্থান !"

'ফরিয়াদ' শব্দটি বাংলা শব্দ নয়। পার্সী শব্দ। এর বাংলা অর্থ প্রতিবাদ। মুসলিম শাসনকাল থেকে ব্যাপক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলা শব্দ ভান্ডারে আগন্তুক শব্দ হিসাবে এর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। বাংলা 'প্রতিবাদ' শব্দের চেয়ে এই শব্দের ব্যঞ্জনায় প্রতিবাদের জোর বেশি বলে কবিতাটির নামকরণে শব্দটির ব্যবহার করে নজরুল শিল্প - বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

এই কবিতার ফরিয়াদ যুগ -যুগান্ত - ব্যাপী বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কবি কণ্ঠে এই প্রতিবাদ উচ্চারিত হচ্ছে যুগ যুগান্তব্যাপী শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষের হয়ে। সেই জন্য এই কবিতার 'আমি' এক 'কালেকটিভ হোল' - কে প্রতিনিধিত্ব করছে,

কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করার সময় তাতে যুক্ত হয়েছে নজরুল-মনীষার ওজস্বিতা। এই কবিতার ফরিয়াদ যা তিনি ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেছেন তা আসলে তুলে ধরেছেন বৃহত্তর জনতারই দরবারে। এইখানে নজরুল জন জাগরণের চারন কবি। আর জনজাগরণের যিনি চারণ কবি তাঁর কবিভাষা হয় উদ্দীপক, সপৌরুষ, উচ্চারণ হয় বলিষ্ঠ, আবেদন হয় আবেগমন্ডিত। এই সবগুলিই 'ফরিয়াদ' কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। কাজেই কবিতাটির নামের সাথে সর্বাঙ্গীন আবেদনটিও ধরা পড়েছে যথাযথ।

নজরুল চিরকাল তাঁর কবিতায় বাংলার পাশাপাশি আরবী-পার্সী-উর্দু বা কদাচিৎ হিন্দী শব্দও ব্যবহার করেন ; কোথাও কোথাও এই মিশ্রণ অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে হিন্দু-বাঙালীর রসাস্বাদনে বাধার সৃষ্টি করেছে ; কিন্তু এ কবিতার নামের মধ্যে পার্সী শব্দ থাকলেও ঐ পূর্বোক্ত অভিযোগ করা যাবে না। এখানে ব্যবহৃত আগন্তুক শব্দের তালিকা দীর্ঘ নয়, ঠিক উল্টোটাই। 'ফরমান', 'গোরস্থান', 'কশাই', 'চেহারা', 'ডাকু', 'কামান', 'আইন', 'ছোরা', 'গর্দান' প্রভৃতি। কিন্তু এর তুলনায় তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহারই দেখা যাচ্ছে এ কবিতায়। আচরন লক্ষণীয়, তৎসম শব্দের পাশে কেমন নিতান্ত চলিত - প্রতিদিনের কথ্য শব্দ ব্যবহারে তিনি নির্দ্বিধ ও স্বচ্ছন্দ। বস্তুত, শব্দের ব্যাপারে নজরুল কোনদিনই ছুৎমার্গী নন - তাই অবলীলাক্রমে তিনি 'বীজন', 'পৃথ্বী', 'রসনা', 'কলাপ' ইত্যাদির মত অপেক্ষকৃত কম ব্যবহৃত তৎসম শব্দের পাশাপাশি 'কাব্য-শব্দ নিতি', 'মাগে', 'উড়ায়ে', ছেদি', 'হেরি' ইত্যাদি আবার এদেরই সঙ্গে একযোগে 'হরিবে', 'জোগাইবে', 'রোধে' 'সৃজিলে' ইত্যাদি নামধাতু এবং সেইসঙ্গে 'ঢিবি', 'টুঁটি টিপে', 'জোঁক', 'ধড়িবাজ' ইত্যাদি কথ্য শব্দের অকাতর ব্যবহারে 'ফরিয়াদ' কবিতার ভাষা এক স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে, কবিতাটিও।

দারিদ্র্য :

নজরুলের কাব্যভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরাধীনতা সামরিক রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্র্য ও অসাম্যের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ও বিদ্রোহ যা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন কাব্যে। বস্তুত তিনি কেবল কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হননি সেই সঙ্গে সক্রিয়ভাবে প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাব্যে যে ভাব বা বানী তিনি উচ্চারণ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনাভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত এবং তাঁর জীবন ও পর্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। 'অগ্নিবীনা', বিষের বাঁশি' প্রভৃতি উদ্দীপক কাব্যগ্রন্থে কবি যেমন সরাসরি ভাবে তাঁর বিদ্রোহ ও সংগ্রামী চেতনাকে প্রকাশ করেছেন তেমনি 'সিন্ধু হিন্দোল', 'বুলবুল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে জীবনের গভীরতম অনুভব ও বিদ্রোহকে ভিন্নমাত্রিক স্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দারিদ্র্য' কবিতায় কবি দারিদ্র্যের সুমহান আদর্শ ও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটির পশ্চাৎপদে তাঁর

টিপ্পনী

ব্যক্তিজীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের দিনগুলি ছায়াবিস্তার করেছে।নিজের অভাবগ্রস্ত জীবনের নানা সমস্যা সংকট কবিকে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর বোধ বিশ্বাস, আদর্শ-কর্তব্য ও জীবন সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত হননি। তাই কবি দারিদ্র্যের মহান আদর্শ ও প্রভাবের কথা দিয়ে কবিতাটি শুরু করেছেন -

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কন্টক - মুকুট শোভা !"

বস্তুত দারিদ্র্যের এই গর্বান্বিত মহিমার মধ্যে কবি তাঁর জীবনবোধের সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আসলে দুঃখ, দারিদ্র্য, মানুষকে 'আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়' সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ফলে মানুষের মধ্যে আসে দুর্জয় শক্তি, অদম্য সাহস এবং বিদ্রোহের বাণী -

" দিয়াছ, তাপস
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধৃত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার !"

দুঃখের দুঃসহ তাপে কবি যেমন সাহস সঞ্চার করেছে, তেমনি খুঁজে পেয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা। তাই বীণার বদলে তুলে নিয়েছেন বিদ্রোহের তরবার'। বিদ্রোহী কবিতায় কবির বজ্রঘোষণা -

"মহা - বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন - রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে বণিবে না -"

কবি অনুভব করেছেন এই দারিদ্র্য কবির স্বপ্নকে সফল হতে দেয়নি -

"বেদনাহলুদ - বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকাশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া - সম।"

কবি জানেন অমরা'র অমৃত সাধনা তাঁর জন্য নয়। তিনি এই দুঃখের পৃথিবীতে, অত্যাচারের পৃথিবীতে বিষধর সাপের মতো সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন। দারিদ্র্যই কবিকে শিখিয়েছে -

টিপ্পনী

"ধরণী বিলাস - কুঞ্জে নহে নহে কারো
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,"

আসলে দারিদ্র্য যেন কবিকে বিলাসের ভোগকুঞ্জ থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনের সংগ্রাম মুখর, পটভূমিকায় উপনীত করেছেন - সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

টিপ্পনী

জীবনের দুঃখ, বেদনা, দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবি যেমন মহত্তর উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন তেমনি এই দুঃখ দারিদ্র্য কবিকে আত্মসচেতন ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে তুলেছে। তবে নজরুল দারিদ্র্যের এই করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাননি। ব্যক্তিগত জীবনে এই দারিদ্র্যের জ্বালা, লাঞ্ছনা তাকে ভোগ করতে হয়েছে। তাই বাঁশি তিনি বাজাতে পারলেন না। ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠলেন -

"দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি ! কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথায় পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ? - ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া ক'রেছি পান নয়ন - নির্যাস। .....

কিন্তু দারিদ্র্যের এই দুঃসহ যাতনায় কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি - জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়েননি। বরং শক্তি সঞ্চয় করে দুঃখের জয়টীকা পরে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়েছেন। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় কবি বলেছেন -

"রক্ত ঝরাতে পারিনা ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !"

এই জীবনবোধ ও সংগ্রামী চেতনা নজরুলকে বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র মহিমা ও বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী

নজরুল বাংলা কাব্যের সেই কবি যিনি জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রমী হয়ে উঠেছিলেন এবং দুঃখে -তাপে-দারিদ্র্যে জীবনকে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। তাই জীবনের সমস্ত হলাহল পান করেও নীলকণ্ঠ কবি নজরুল জীবনের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন। আলোচ্য 'দারিদ্র্য' কবিতায় কবির দুঃখজয়ী জীবনবোধের প্রতিভাস যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি নজরুলের কাব্যধর্মের স্বরূপ আবিষ্কার করতেও বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

টিপ্পনী

বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি :

আবহমান কাল বাংলা কবিতার ধারায় নজরুল ইসলাম এক বিচিত্র ও বহুমুখী কৃতিত্ব । বাংলা কবিতা ও সংগীতের ইতিহাসে নজরুল নিঃসন্দেহে এমন একটি অধ্যায়ের যোজনা করেছেন যা তাঁকে এক স্মরণীয় কৃতির অধিকারী করেছে। নজরুলের আবির্ভাবের পটভূমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দাবিতে মুখর । নজরুল যুগের এই দ্বন্দ্বমুখরতাকে তাঁর কাব্যে রূপায়িত কচরতে চেয়েছেন, ফলে তার কবিতায় শিল্পরূপের চর্চা অপেক্ষা বক্তব্য রূপের প্রাধান্য লক্ষ্যগোচর। কিন্তু এই জাতীয় ধারনা সম্পূর্ণ সত্য হয়ে উঠতে পারে না। যখন তাঁর কবিতার শিল্পরূপের ও গঠনকৌশলের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি । অনেকে ভাবেন, নজরুল শুধুই বিদ্রোহী কবি, অথচ তাঁর কবি সত্তার গভীরে এক মরমীয়া, আধ্যাত্মিক কবিপ্রাণ লুকিয়ে ছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিক সত্তাও তাঁর কোন কোন কাব্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' সেই রকমই একটি প্রেমের কবিতা।

কবিতাটি ১৯২৯ সালের ১৪ জানুয়ারী আবিবউল্লাহ বাসার ও শামসুন্নাহার ভ্রাতা - ভগিনীর বাসায় বসে লেখা। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ককালি - কলম' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের সংখ্যায় - চৈত্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। পরে 'চক্রবাক্' (১৩৩৬ / ১৯২৯) এবং 'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়।

নজরুল ইসলামের 'চক্রবাক' শ্রেষ্ঠ প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। কাব্যটির মূল সুর প্রেম - বিরহ। এই কাব্যে কবির প্রিয়া আর প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। এখানে কবির স্বভাব বিপ্লবী নির্ঘোষ শোনা যায় না। 'তলোয়ার আর শিঙা' ফেলে রেখে কবিতার উদ্বেল যৌবনে একদিন চট্টগ্রামে গিয়ে সেখানকার মোহন প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। বিরহের স্বর্গলোক তার চেতনায় মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেদিনের স্মৃতিতে রচিত হয়েছিল 'বাতায়ন পাশে 'গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি, যা 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের ২১ টি কবিতার মধ্যে অন্যতম।

১৯২৯ - এর জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রামের বাহার - নাহারদের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ কালে ঘরের জানালার (বাতায়ন) পাশে পুকুরের কিনারায় নয়টি সুপাচরি গাছ (গুবাক তরু) দেখতে দেখতে কবি লিখলেন এই মনোময় কবিতাটি। তবে কবিতাটিতে শুধু প্রকৃতি নয়, মানবী প্রাণের অস্তিত্বত্ত আছে বলে মনে হয়। কবির প্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে একাকর হয়ে প্রকৃতির প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন কবি। গুবাক তরুর সারির সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাষণে রত। একে ছেড়ে যেতে হবে বলে তিনি ব্যাথায় অভিভূত। 'বাতায়ন পাশে নিশীথ জাগার সাথী'কে কবি বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন বিদায়ের রাত্রি পান্ডুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু জানলার মিলিমিলি নয়, নিরিবিলি আলাপনও বন্ধ হ'ল বৃক্ষরাজির সঙ্গে। কিন্তু তা আংশিক সত্য কেননা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ বন্ধ হ'ল বলে আসন্ন বিদায়ের রাত্রি বিরহ - বেদনায় বিধুর -

"অস্ত - আকাশ অলিন্দে তার শীর্ণ - কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মসফির জাগো, নিশী আর নেই বাকী।"
নিশীথিনী যায় দূরবন - ছায় তন্দ্রায় ঢুলুঢুল্
ফিরে ফিরে চায়, দু - হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।"

এখানে কবি যেন মুসাফির - কবিকে সেবা করেছিল শুধুই নিশীথ রাতের সাথী। গুবাক তরুর সারি নয়, সেখানে কোন মাণবী হাতের স্পর্শও ছিল -

"চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিঃশ্বাস লাগে
কে করে ব্যাজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন পাশে জাগিছে স্বপ্নচারি
নিশীথ রাতেদর বন্ধু আমার গুবাক তরুর সারি।"

কবির কাছে প্রকৃতি আর প্রিয়া এক হয়ে যায়। সারারাত ধরে গুবাক তরুর সাথে কথা বলা, কবির কাছে যেন প্রিয়ার সাথে আলাপন। কবির ঘুম না আসা আঁখি পল্লবে গুবাক তরুর পাতা যেন প্রেমিকার সুশীতল করতল বলে মনে হত। বৃক্ষসারির পল্লব মর্মর যেন প্রিয়ার কণ্ঠের সকাতর আবেদন বলে প্রতীয়মান হত।

এই কবিতায় কবির ভিন্নতর প্রেমের আবেগ চিত্রিত। কবি তাঁর প্রেমিকাকে তুচ্ছতায় আবদ্ধ করতে চান না - 'তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর সৃজিব অমরাবতী'। কিশোরীর প্রথম ভালোবাসার এবং নীরব প্রেমের অপরূপ অভিজ্ঞতা প্রকৃতির সুন্দর, শান্ত, মধুশ্রীতে প্রকাশিত -

"সব আগে আমি আসি
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশিথে গিয়াছিগো ভালোবাসি।
তোমার পাতায় লিখিলাম
আমি প্রথম প্রণয় লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর হোক না বা হোক দেখা
.....।"

এইভাবে কবি প্রকৃতির রূপকল্পে নিজের প্রিয়াকে দেখেছেন। কবি চলে গেলে কবি প্রেমিকা হয়তো সারাদিন একাকিনী আপন খেয়ালে মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা গুবাক তরুর সাচরি অসহায়, দিবসে রৌদ্রদাহ আর নিশীথে হিমশীতলতা, কবির সংশয় - 'কি হবে রিক্ত ভরিয়া, আমার ব্যাথার দানে'। আসলে এখানে প্রকৃতি যেন প্রীবা আর গুবাক তরুর সারির বাতাস কবির কাছে প্রিয়ার হাতের স্পর্শ বলে মনে হয়। ফলে কবিতাটি কল্পনার জগত থেকে নেমে এসে শরীর শীহরণষের ছন্দোবদ্ধতার দূর জগতেদর নায়িকাকে সীমার বাঁধনে স্থাপিত করে। সুশীতল করতল, কণ্ঠের আবেদন, আঁখির কাজল লেখা, দিঘল দেহের রেখা, শাড়ির আঁচল শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সার্থকতায় উন্নীত হয়, কবি যখন গোপন প্রিয়ার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অঙ্গুলী স্পর্শ তপ্ত ললাট চুম্বন অনুভব করেন। নজরুলের প্রেম কবিতায় অসীম আকৃতির সঙ্গে সীমার দেহস্পর্শ যে ব্যঞ্জনা বহন করে আনে আলোচ্য কবিতাটি তার স্মরণীয় উল্লেখ্য লক্ষ্যগোচর।

'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতাগুলির মত 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি সঙ্গীত ও চিত্র সমৃদ্ধ। এখানে প্রকৃতি আসে প্রিয়া রূপে নারী ও পুরুষের চিরন্তন হৃদয়াবেগের প্রতীক রূপে। সমাজন সচেতন বিদ্রোহী নজরুলের পরিবর্তে এখানে নিসর্গ বিরহ - বেদনার্ত নজরুলের উপস্থিতি। আসলে রোমান্টিক কবির কবিতায় পৃথিবী তৃপ্তি লাভ করে যদিও কবির মনে প্রাণে ধাকে রিক্ততার জ্বালা। প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধানী কবিচিত্ত প্রেমের জন্য চিরতৃষ্ণাতুর। তার পরিতৃপ্তি নেই। 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'তে সেই চির অতৃপ্তির হাহাকার, রোমান্টিক অন্বেষার চিরন্তন আকুতির বেদনা বিহবল সঞ্চরন।

কান্ডারী হুঁশিয়ার :

'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে বসে কবিতাটি লেখেন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ। এই কবিতাটি সংগীত হিসেবেও বিশেষ পরিচিত। কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলণে (২২শে মে, ১৯২৬) 'কান্ডারী হুশিয়ার' প্রথম গাওয়া হয়।

কবিতাটি রচনার পেছনে একটা পটভূমি ছিল। কবি নজরুল 'ধুমকেতু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলে পর রাজরোষে পড়েন এবং তিনি কারাবন্দী হন। সেখান থেকে মুক্ত হন। সংসার জীবন শুরু করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ১৯২৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে। যদিও এই দাঙ্গার পেছনে রাজনৈতিক মদতও ছিল। এই ভয়াবহ দাঙ্গা কবিকে ভীষণ পীড়িত করে। অত্যন্ত বিচলিত কবি তখন তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেন 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার মধ্যে দিয়ে।

দেশের এমন সংকটকালে কবি সন্ধান করেছেন একজন প্রকৃত দেশ নায়ককে। তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে কবি তাঁকে সতর্ক করেছেন -

"দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যত।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি' নিতে হবে তরী পার।।"

তাই কবি দাঙ্গার এই প্রেক্ষাপটে সাহসী জোয়ান দেশনেতাকে আহ্বান করেছেন

যাতে দেশের এই তমসা কেটে যায়। এক জন প্রকৃত নেতাই পারবেন এ অন্ধকার দূর করতে, মানুষকে স্বাধীন করতে ; কবির বিশ্বাস । বিশিষ্ট নজরুল বিশেষজ্ঞ আজাহারউদ্দীন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থে তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন -

> "কবিতাটি কিছুটা রূপকধর্মী । স্বাধীনতাকামী জনগণকে অভিযাত্রীরূপপে, জাতীয় জীবনকে তরণীরূপে, স্বাধীনতার পথের প্রচন্ড বাধা-বিপত্তিকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্ররূপে, পরাধীনতার হতাশার অন্ধকারকে নিশীথের আঁধাররূপে তুলনা করা হয়েছে। অগণিত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে যিনি স্বাধীনতার কূলে নৌকাকে ভিড়িয়ে দেবেন তিনিই হলেন এ কবিতার কান্ডারী।"

কবিতার প্রথম দুই পংক্তিতে আছে স্বাধীনতাকামী মানুষের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী। তারপর কবি কান্ডারীর উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী করেছেন। তিনি বলেছেন কান্ডারী বা সেই সাহসী জোয়ানের দায়িত্ব হল এই ভয়াবহ তুফানের মধ্যে দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতার স্বর্গে উত্তীর্ণ করতে হবে। আসল কথা হ'ল মুক্তি । তার অবশ্য নানান অর্থ ব্যঞ্জনা আছে। বাহ্যিক ও আত্মিক দুই-ই হতে পারে। এই মুক্তির লক্ষ্যে লড়াইতে নেমে কিছু অবাঞ্ছিল ঘটনা যেন দেশনেতাকে পেছনে না টানে। যেন তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন। কারণ সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে অশক্ত দেশনেতার পক্ষে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। ইতিহাস বলে এমন অনেক ঘটনা যা মূল লড়াইকে পথভ্রষ্ট করেছে। কবি তাই দেশ-নেতাকে হুঁশিয়ার হতে বলেছেন।

তৃতীয় স্তবকে কান্ডারীকে কবি 'মাতৃমন্ত্রী' সম্বোধন করেছেন। অবশ্য এমনও হতে পারে এই 'মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা' কান্ডারীর সহযোগী । যাইহোক, এই মাতৃমন্ত্রি সান্ত্রিদের সতর্ক করে কবি জানিয়েছেন সামনে 'তিমির রাত্রি'। সেই তমসা ভেদ করে যারা অভিযান ঘোষণা করেছে তাদের বুকের ভিতর রয়েছে যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা। কবি বলেছেন, চিরকাল ধরে যারা বঞ্চিত, অবহেলিত, তাদের বুকের ভিতর রয়েছে পুঞ্জিত অভিমান। এঁদেরকেও স্বাধীনতার সংগ্রামে নিতে হবে। অধিকার দিতে হবে এঁদের -

> "যুগ যুগন্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
> ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
> ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।"

চতুর্থ স্তবকে বক্তব্য হল অসহায় জাতি সাঁতার জানে না। কাজেই তাঁরা ডুবছে ।এই বিপদের সময় কবি কান্ডারী দেশনায়কের মাতৃমুক্তিপণের দৃঢ়তা দেখতে চান; দেখতে চান এই নিমজ্জমান জাতিকে তিনি উত্তরণের পথ দেখাবে। এই ডুবে যাওয়ার কারণ হিসেবে কবি হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের মত নিম্নবৃত্তিকে দেখিয়েছেন। কিন্তু, পাশাপাশি কবি কান্ডারীকে অসাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, তাই কবি

টিপ্পনী

কান্ডারীকে পরামর্শ দেন -

"কান্ডারী ! বল ও ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।"

পঞ্চম স্তবকের পটভূমি গিরি সঙ্কট। এই স্তবকে কবি বলেছেন - বজ্র গর্জন করছে, গিরি সঙ্কটের পথ ও দুর্গম, যাত্রীরা ভীরু। বিশেষত যারা পেছনে রয়েছেন, তাদের মনে সন্দেহ জেগেছে। এমতাবস্থায় কবি কান্ডারীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, যা কান্ডারী যেন পথ ভুল না করেন, অথবা মাঝপথে তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ না করেন, যে মহান দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন, তা যেন শেষ পর্যন্ত নির্বাহ করেন তিনি। এই পংক্তিতে কবির বিশেষ বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনেই নিহিত রয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদ বিলুপ্তির সম্ভাবনা।

পরবর্তী স্তবকে কবি ইতিহাসের প্রসঙ্গ এনেছেন। পলাশীর প্রান্তরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্লাইভের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে লড়াই করেছিল হিন্দু-মুসলমান। স্বাধীনতার সেই সূর্য হিন্দু - মুসলমানের সম্মিলিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই পুনরুদিত হবে - 'উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

কবিতার শেষ স্তবকেও কবি ইতিহাস প্রসঙ্গ বজায় রেখেছেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, ফাঁসীর মঞ্চে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন আজ। কবির প্রশ্ন কোন্ বলিদান দিয়ে কান্ডারী তাদের সম্মান জানাবেন? তারপরই তিনি প্রশ্ন করেছেন -

"আজ পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?"

কবিতার পূর্ববর্তী ছটি স্তবকে কান্ডারীকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে তার দায়িত্ব ও কতর্ব্য সম্পর্কে সচেতন করে শেষ স্তবকে তাঁকে একা কর্মযজ্ঞের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং লক্ষ্য করতে চাইছেন তাঁর ক্রিয়া। তাই কবিতার শেষে আর একবার পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও জটিলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন।

দেশ আজ স্বাধীন হলেও যে যে সমস্যার কথা কবি উল্লেখ করেছেন এ কবিতায় তা থেকে কান্ডারীকে মুক্ত করতে আহ্বান করেছিলেন কবি। সাম্প্রদায়িকতা, মানুষের প্রতি বঞ্চনা, অলব্ধ অধিকার। যাত্রী ভারতবাসীর ভীরুতা; হতাশা - এসব আজও বিদ্যমান। তাই আজও এ কবিতা প্রাসঙ্গিক। নামকরণ ও যথাযথ। কান্ডারীকে নানান বাধা - বিঘ্নকে চিনিয়ে দিয়ে কবি হুঁশিয়ার করেছেন। এই বার্তাই কবিতার মূলে। তাই নামকরণ ও যথাযথ। আর একটি প্রসঙ্গ বলা যায়, তা হল গান হিসেবে গীত হয়ে কবিতাটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপনী চারণ-সংগীতের গৌরবময় ভূমিকা নিয়েছিল। সেই দিক দিয়ে কবিতাটিকে 'মেলিক কবিতা' ও বলা যায়।

প্রশ্নাবলী :

১. কান্ডারী হুঁশিয়ার কবিতাটি যে বিশেষ প্রেক্ষাপটে রচিত তা উল্লেখ করে কবিতাটির মর্মার্থ আলোচনা করো।

২. 'সাম্যবাদী'র কবিতার মধ্যে কবি নজরুলের যে সাম্যবাদী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩.'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটিতে কবি নজরুলের রোমান্টিক কবি আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় - আলোচনা করো।

৪. 'আট বছর আগের একদিন' - কবিতাটির গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করো।

৫. 'শাশ্বতী' চির প্রেমের কবিতা হিসেবে কতটা সার্থক বিচার করো।

৬. 'বৃষ্টি' কবিতার মূল ভাববস্তু আলোচনা করো।

৬. 'আমি কবি যত কামারের' কবিতায় কবি যে কথা বলেছেন তা আলোচনা করো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

আধুনিক বাংলা কবিতা

আট বছর আগের একদিন : জীবনানন্দ দাস

টিপ্পনী

ক্লান্তি ও মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দ দাসের তথা আধুনিক কাব্যের অন্যতম মূল সুর। রেইনার মারিয়রের 'Sonnet's to Arphuse' (সনেট টু অরফিউস) কবিতাগুচ্ছ এমনকি এলিয়টের কাব্যেও মৃত্যুচেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর জীবনানন্দের 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায় মৃত্যু ও জীবনসন্ধির টানাপোড়নের রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আসলে আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এযুগের সংশয়ী মানবত্মার ক্ষত বিক্ষত পরিচয়টি ফুটে ওঠে। সারা জীবন তাঁর পেছনে এক অতৃপ্তি তাড়া করে ফিরেছে। জীবন সমুদ্র মন্থনের বিষ তাঁকে পান করে নীলকণ্ঠ হতে হয়েছে। এজন্য তাঁর কাব্যের ট্রাজিক মহিমা এত বেশি। তাঁর 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায় এই জীবন ও মৃত্যু চেতনা, অতৃপ্তি, ট্রাজিক মহিমা - প্রভৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং জীবনানন্দের কবিতার নামকরণ তাঁর নিজের জীবনের ব্যঞ্জনার মতই তাৎপর্যপূর্ণ হবে এটাই স্বাভাবিক।

কবিতার শুরুই হয়েছে মর্গে লাসকাটা ঘরে এক আত্মহত্যাকারীর চিত্র দিয়ে। আসলে মর্গ, লাসকাটা ঘর, আত্মহত্যাকারী এগুলির কোনটাই কবিতার বিষয় হতে পারে না। কিন্তু এখানে হয়েছে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি আসলে expressionist কবিতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের expressionist লেখক গট ফ্রিড বেন 'লাসকাটা ঘর' নামে এক প্যামফ্লেট লিখে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, আর জীবনানন্দ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় একটা অতৃপ্তি, একটা অস্বস্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবি দেখেছেন সংসার নির্বাহ করছে কত মানুষ স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে। প্রণয় ব্যর্থতাও সকলের আসেনি। জীবনের স্বাদ গ্রহণের জন্য আছে নারী হৃদয়, প্রেম, শিশু, অর্থ আরো অনেক জীবন সম্ভোগের উপাদান। অথচ জীবনে এসেছে ক্লান্তি। তাই ফাল্গুনের রাতের আঁধারে একটি স্বাদু জীবন রক্তের পথে শেষ হয়ে গেল আত্মহত্যায়।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী

কিন্তু এই ক্লান্তি কেন? কবি বলেছেন 'বিপন্ন বিস্ময়' -

নারীর হৃদয় - প্রেম - শিশু - গৃহ নয় সব খানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় -
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

টিপ্পনী

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে।

'বোধ' কবিতাতেও তিনি এই তাড়নার কথা বলেছেন -

"স্বপ্ন নয় - শান্তি নয় - ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় !
আমি তাঁরে পারিনা এড়াতে,"

এই যে 'বিপন্ন বিস্ময়' বা 'বোধ' যাই বলিনা কেন এর কাছে কবি অসহায়। দিনের আটটি প্রহরের শেষ প্রহর অর্থাৎ অষ্টম প্রহরেই লোকটির আত্মহত্যার চিন্তা এসেছে। অর্থাৎ জীবনের অষ্টম প্রহরেই বিষাদ বা এই 'বিপন্ন বিস্ময়' আসে।

প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের চাওয়া পাওয়ার সমাপ্তি ঘটলেও মনের ভিতর এক অতৃপ্তি বোধ কাজ করে চলে, মুক্তির বাসনায় মানবমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর সেই তাড়নায় মানুষ চরম শান্তির খোঁজে চলে যায় লাস কাটা ঘরে।

"যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের - মানুষের সাথে তাঁর হয়না কো দেখা
এই জেনে।"

এখানেই কবি সুররিয়্যালিষ্ট চিন্তায় পরাবাস্তবকে খুঁজতে মগ্ন চৈতন্যে প্রবেশ করেছেন।

এই কবিতাটিতে কবি জীবনের স্বাদ ও অবসাদকে পাশাপাশি এঁকেছেন। স্বাদের মধ্যেও যেন কোথায় অবসাদ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু জীবনকে শেষ করে দিয়ে কখনোই শান্তির সন্ধান নয়। এই কবিতার শান্তির সন্ধানে জীবন ও মরণ - এই দুই 'এর টানা পোড়নের রূপটি প্রকট হয়ে ওঠে, সংসারী লোকেদের মত প্রেম - সন্তান- সচ্ছলতা - খ্যাতি কবির স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারে না। অথচ সৃষ্টির দুর্মর আবেগের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে তিনি ক্লান্ত। সে জন্য আত্মহত্যাকারীর দৈহিক মৃত্যু তাঁর মনের আত্মিক ইচ্ছার মৃত্যুকে জাগ্রত করেছে। জীবনের যে বোধ কবিকে বার বার বিচলিত করেছে, তাঁর থেকে তিনি মুক্তি পেতে চেয়েছেন। সেই কারণে আত্মহত্যাকারীর জন্য তিনি সমব্যথী। সে এখন 'লাসকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে'। সেখান থেকে জেগে আর তাকে জীবনের ভার সইতে হবে না -

"কোনদিন জাগিবেনা আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম - অবিরাম ভার
সহিবে না আর -

এই যে 'life of steel', speed and fever' থেকে বহির্গমন তা জীবনান্দের 'অন্ধকার' কবিতাতেও প্রতিফলিত।

"অন্ধকারে স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থাকতে চেয়েছি।

.....

কোনদিন জাগবো না আমি কোনদিন আর।"

কিন্তু ব্রেখ্‌ট যেমন জীবনের ট্র্যাজেডি ও কমেডিকে একই ঘটনার মধ্যে বিবৃত দেখেছেন, জীবনানন্দও তেমনি মৃত্যুর মধ্যেও জীবনাসক্তিকে ফুটিয়েছেন।

"তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
প্রভাতের ইশারায় - অনুমেয়
উষ্ণ অনুরাগে।"

অথবা -

"রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রোদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি।"

আসলে এই কবিতায় আত্মহত্যা যেন আত্মহত্যা নয়, চার পাশের জড়তাঁর বিরুদ্ধে সংবেদনশীল মানবাত্মার বিদ্রোহ। সে জানে একদিন তাঁরও মন পেঁচার মত বুড়িয়ে যাবে, দৃষ্টি হবে আচ্ছন্ন। তাই শেষ পর্যন্ত 'প্রগাঢ় পিতামহী' 'থুরথুরে অন্ধপেঁচা' অর্থাৎ প্রাণময় সত্তার আদিম আনন্দ তাকে 'morbidity' অতিক্রম করে জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার' শূন্য করবার আমন্ত্রণই জানিয়েছে।

শাশ্বতী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ একটি উজ্জলতর নক্ষত্র। রবীন্দ্র প্রভাবিত বাংলা কবিতার দিক বদল ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তিরিশের দশকের পাঁচজন বাঙালী কবি জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের অভিনবত্ব এই যে, প্রস্তুতিপর্বে তিনি স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রভাব পরিগ্রহ ও মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সতর্কভাবে গ্রহণ করেছেন নিজস্ব অবলোকন ভঙ্গি ও উচ্চারণ রীতিকে। তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত প্রেমিক কবি। কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রতারণা ও প্রবঞ্চনাবিদ্ধ কবি হৃদয়ের হাহাকারই বেশি ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় শরীরী প্রেমের ভাষা অকপট, অকুণ্ঠ ও অরাবীন্দ্রিক।

'তন্বী' (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব সত্তা সুস্পষ্ট রূপ লাভ না করলেও তাঁর প্রেমভাবনার মৌলগুলি ছিল যেমন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(১) মিলনোত্তর অবসাদ ও শূন্যতায় উচ্চারণ যা পরবর্তীতে তৃষ্ণায় রূপান্তরিত।

(২) স্মৃতি নয় অতীতের আহ্বান।

(৩) ভুল, ত্রুটিপূর্ণ মানসিক সত্তায় বিশ্বাস। শ্বাশ্বত স্মরণে অনাস্থা।

(৪) প্রেমের সূত্রে মর্ত্যপ্রীতি।

কবির এই প্রেমভাবনা এমনই পরিবর্তিত হয়েছে। 'অর্কেষ্ট্রা' (১৯৩৫) কাব্যে প্রেমের একটি ভিন্নতর অবয়ব পাওয়া যায়। এখানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতাঁর ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির যোগ ঘটেছে। এই কাব্যের 'শাশ্বতী' একটি প্রেমের অপরূপ গীতি কবিতা। আলোচ্য কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। অনাবিল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম আশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁর শাশ্বত প্রেমের যাত্রীকে উৎসর্গ করেছেন প্রেম। প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রেমের গভীর এই কবিতাটিতে মাধুর্য্য ও প্রশান্তির হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছে। কবির বিদেশিনী প্রেয়সীর স্মৃতি এ কবিতায় এভাবেই বিদ্যমান - 'সেদিনও'। অতীতার্থক 'সেদিনও' শব্দ এবং সোনালী চুলের অর্থবোধক 'চিকুরের পাকাধানে' এর ব্যঞ্জনার্থে কবির প্রিয়া বিদেশিনীর কথা স্মরণ করায়। এখানে নায়িকার প্রেমে সমস্ত বিশ্বসংসার, কালচেতনা, চাওয়া-পাওয়া একাকার হয়ে গেছে। এক প্রেমানুভবের বিন্দুতে সমস্ত বিশ্বসংসার একাগ্র হয়ে উঠেছে। এই মহৎ প্রেমের আত্মপলব্ধি কবিচিত্তে দ্বন্দ্বহীন প্রশান্তি এনে দিয়েছে। কবিতাটির প্রথম স্তবকটিকে শরৎ বন্দনা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

"শ্রান্ত বরষা, অবহেলার অবসরে
প্রাঙ্গনে মেলে দিয়েছে শ্যামল - কায়া;
স্বর্ণ সুযোগে লুকোচুরি খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি;"

এরপরেই আমরা দেখি শাশ্বত প্রেমিকা সাধারণ থেকে বিশ্বময় হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর প্রেমানুভব দ্বারা প্রেয়সীর মধ্য দিয়ে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে দেখেছেন।

"অমল আকাশে মুকুরিত তাঁর হৃদি
দিব্য শিশিরে তাঁরই স্বেদ অভিষেকে
স্বপ্নালু নীশা নীল তাঁর আঁখিসম;
সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে;"

আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি নন অথচ রোমান্টিক কবির মতো তাঁর প্রেম স্মৃতি মাত্র। সেই প্রেমের স্মৃতিই আজ তাঁর জীবনে পরম সত্য হয়ে বেঁচে আছে। তিনি

অতীত স্মৃতির আশ্রয়ে বর্তমান প্রিয়াকে এ কথাই বলেছেন -

"আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতি পিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না।"

আসলে এ কবিতায় কবি এই সত্যটিই তুলে ধরতে চাইছেন, পূর্বতন প্রেমিকার প্রেম শাশ্বত নয়। কিন্তু কবির কাছে কালের প্রেমিকা শাশ্বত। বর্তমান প্রেমিকার মধ্যে অতীতের প্রেমিকার মিলন ঘটেছে। তাই তাঁর অতীতের প্রেমিকাকে বর্তমানের পটভূমিকায় ছড়িয়ে দিয়েছেন আকাশ - বাতাস - ফুল নানা রূপের মধ্যে। আর এ কবিতায় এখানেই অ্যান্টি রোমান্টিক সুধীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন স্মৃতি মেদুরতাঁর কবি।

এই কবিতায় আরো একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট। সুধীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর যে নিরন্তর অতৃপ্তি বোধ ছিল তাঁরই একটা প্রতিফলন এখানে ঘটেছে। তাঁর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এতই তীব্র ছিল যে সবসময় একটা অতৃপ্তিবোধ রয়ে গেছে ; পরিপূর্ণ সুখানুভূতি কখনো আসেনি। সমকালীন বিশ্ব তাকে অবশ্য সেখানে পৌঁছাতে দেয়নি। তাই অবিরাম তাঁর কবিতায় হাহাকার, জীবনকে পরিপূর্ণ করে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের এই কবিতায় যেসব শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা ও কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা করে তুলতে সাহায্য করেছে। আধুনিক কবিদের লক্ষ্য এক একটি শব্দ থেকে কত বেশী আদায় করে নেওয়া যায়। যদিও সব শব্দের মূল্য সমান নয়। মাঝে মাঝে কোন কোনটি চাবির মত কাজ করে - রহস্যের দরজা খুলে যায়। হঠাৎই তাঁর আঘাতে চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ে - চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা কবিতায় -

"পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।"

এখানে 'একবেণী' শব্দতি কবিতার চাবিকাঠি। সেই সংস্কৃত কাব্য থেকেই আমরা বিরহিণী প্রেমিকা বিচ্ছেদের মর্ম বেদনার কথা পড়ে আসছি। মিলনের স্মৃতিটিকে মনে মনে রোমন্থন করাটা একটা সর্বজনীন বিষয় হয়ে রয়েছে। তাই আর অনেক কবির মত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিরহিনীর 'বেণীর' উল্লেখ করতে ভোলেননি।

আবেগ ও যুক্তির সমীকরণে তাঁর কাব্য প্রকরণ উৎসুক মনোলোকের দাবি করে। বস্তুত বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মনন ও আবেগের সমীকরণে। আবুসয়ীদ আইয়ুবের ভাষায় -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"The balance between passion and logic that he has achived is unequalled in bengali poetry, and is his greatest contribution to it."

সবমিলিয়ে বলতে পারি সমকালের কবি সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় বিশ্বসম্পর্কে এ নৈরাশ্য, ভাবাতুরতা, পরিহাস, বিদ্রুপ রয়েছে তাঁর সঙ্গেও তাঁর মধ্যে যে রোমান্টিক স্মৃতিমেদুরতা জীবন্ত ছিল তা অনুভব করা যায়। আলোচ্য 'শাশ্বতী' কবিতায় যা এই কবিকে কিছুটা রবিকরোজ্জল প্রেমের আকাশের নিচে এনেছে।

বৃষ্টি (কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে) : অমিয় চক্রবর্তী

দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য - ধন্য এবং রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্র - পরবর্তী আধুনিক কাব্যের জগতে এক বিশিষ্ট নাম। আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি প্রখর ভাবে আত্মসচেতন ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম দিকের সৃষ্টিতে রবীন্দ্র নির্ভরতা থাকলেও, অল্পকালের মধ্যেই তিনি নিজস্বতাঁর পরিচয় রাখেন বাংলা কবিতার জগতে। পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যজীবন শুরু হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'বিচিত্রা' নামক সাময়িক পত্রে। যদিও কবি ১৬ বছর বয়সে 'সমবয়সী' নামে একটি সনেট লিখেছিলেন। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'প্রভাতী', 'সায়াহ্নিকা' বা ১৯৩০ এ প্রকাশিত 'সমর্পণ' কবিতায় রবীন্দ্র - প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে পরের বছর ১৯৩১ - এ প্রকাশিত 'তীর্থছায়া' নামক কবিতাতে কবির এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

অমিয় চক্রবর্তীর রচিত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে - 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান - বসন্ত' (১৯৪৩), 'দূরযাত্রী' (১৯৪৪), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৯), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড' (১৯৬৬), 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৯৬৭), 'অমরাবতী' ১৯৭২), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬), 'নতুন-কবিতা' (১৯৮০) ইত্যাদি।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী

অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১ - ১৯৮৬) বৃষ্টি সম্পর্কিত প্রত্যক্ষভাবে তিনটি কবিতা আছে। কবিতা তিনটি হ'ল যথাক্রমে 'বৃষ্টি' ('একমুঠো কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত), 'বৃষ্টি' ('পারাপার' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত) এবং 'এই বৃষ্টি' ('পালাবদল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)। এছাড়া অনুষঙ্গ আছে এমন বেশ কিছু কবিতাও আছে। প্রথম 'বৃষ্টি' কবিতাটির রচনাকাল ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় 'বৃষ্টি' কবিতার রচনাকাল ১৩৬০ বঙ্গাব্দ এবং তৃতীয় 'এই বৃষ্টি'র

রচনাকাল ১৩৬২ বঙ্গাব্দ । আমাদের আলোচ্য 'বৃষ্টি' কবিতাটি 'পারাপার' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। যার শুরু হয়েছে এভাবে -

"কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।"

এই 'বৃষ্টি' কবিতাটির চারটি স্তবক । "এবং এই ছোটো কবিতাটি নরনারীর প্রেম সম্পর্কের আদিম সূত্রপাত থেকে শুরু করে তাঁর ব্যক্তিবন্ধন কাটিয়ে বিশ্বব্যাপ্তিতে উত্তরণের কাহিনী। কবিতাটি শুরু হয় একটি করুণ নেপথ্যসঙ্গীতের সুর দিয়ে - 'কেঁদেও পাবে না তাকে .....'। তাঁরপরেই ছবি শুরু হয়ে যায়। ফাল্গুনের বিকেল, বৃষ্টি, শহরের রাস্তা, জলস্রোত, তীব্র হাওয়া, আকাশে বিদ্যুৎ। ছবিগুলি নড়াচড়া করে। বৃষ্টি নামে, অন্ধকার দ্রুত আসে, জল পাথরে লুটোয়, মেঘ বিদ্যুৎ হানে। ছবিগুলি রঙ বদলায়। অন্ধকার দ্রুত ঘন হয়, বিদ্যুৎ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে, তাঁরপরেই কালো দিন এবং তাঁরপরেই সিনেমার থীম সং- এর মতো 'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে ।' দ্বিতীয় স্তবকটি হঠাৎ 'কাট্' করে ঢুকে পড়ে নায়কের স্মৃতির সূত্রে একটি অতীত দৃশ্যে - সিনেমার ভাষায় ফ্ল্যাশব্যাক । অতীতের আর একটি বর্ষার দিন, গলির শেষে সূর্যাস্তের ছবি কারো সিঁদুর বিন্দুর স্মৃতি, অবলুপ্ত হয় বর্তমান -

"নিভে যায় চোখে
কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।'

তাঁরপরেই আবার বর্তমান দৃশ্যে ফিরে আসে কবিমনের ক্যামেরা -

" বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।'

আবার সেই গানের সুর - 'কেঁদেও পাবে না .....।"

(কবি অমিয় চক্রবর্তী / সুমিতা চক্রবর্তী)

এ কবিতার এক ধরনের ব্যাখ্যা পেলাম আমরা উপরের আলোচনায় । তবে আমাদের ভাবায় আর একটু। এখানে যাকে পাওয়া যাবে না কেঁদে। সে কে ? এর উত্তর দেওয়ার কবিতা এটি নয়। তবে এটুকু বোধ হয় আন্দাজ করা যায় সে একজন পুরুষ নয়, নারী। একজন মানুষের একক বিচ্ছেদের বেদনার রূপান্তর প্রসঙ্গ বর্ণিত এ কবিতায়।

কবিতাটি শুরু হয়েছে কোন ভনিতা ছাড়াই এমন ভাবে -

"কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।"

এরপর বাকী তিনটি পংক্তি ধরে এই বক্তব্যেরই রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। ফাল্গুনের বিকেল, শহরের পথ, পাথরে বাঁধানো গলিপথ, ঘনিয়ে আসে অন্ধকার, বৃষ্টিধারা, হাওয়া এবং আকাশের বিদ্যুৎ - এই ক'টি ছবিতে রচিত হচ্ছে গলি থেকে অন্তরীক্ষব্যাপী এক নাটকীয় ঘটনা। এ নাটকের মঞ্চ একটি বিদ্ধ মানুষের চৈতন্য, এবং তাঁরই দেখা প্রাকৃতিক ঘটনায় সে-

টিপ্পনী

আবেগের প্রতিফলন হচ্ছে মাত্র। শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার নামে। যেমন ভাবে শত্রুসৈন্যরা শহর দখল করে নেয় ; ঘিরে ফেলে, সে রকম। পরাজিত নগরীর শোকবিহ্বল নারীদের মতো বৃষ্টির করুণ জলধারা কঠিন পাথরে লুটিয়ে পড়ে। 'তমস্বিনী' হাওয়ার মধ্যে মিশে থাকে গাঢ় বিষাদ। বিদ্যুৎ - ঝল্‌সানো মেঘ মনে পড়িয়ে দেয় পুরাণবর্ণিত যুদ্ধের কথা, ইন্দ্রের ক্রোধ যখন উদ্যত হয়েছিল। সব কিছু হারানোর স্মৃতিতে কম্পমান একটি মানুষ ধরা পড়ে গেছে যেন এই বিশ্বময় তান্ডবের মধ্যে।

এরপর বৃষ্টি নামে। ঝরঝর ধারে। যার একটানা শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে এক বিশেষ স্বর যা শেষের, অবসানের। একথা কবি নাটকীয় বর্ণনায় আমাদের বারে বারে মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন, মনে করিয়ে দিচ্ছেন। 'চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা' - র সংহতি লক্ষ্যণীয়। ফাল্গুন মাসের মেঘ বর্ষার মেঘের মত আকাশকে আচ্ছন্ন করেনি। মুহূর্তের জন্য দিন শেষের লাল আভা পশ্চিম আকাশে দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায়। যার যোগ্য উত্তর জাগলো না কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল রেখায়। কেননা বোবা বাড়ি সজীব বৃক্ষ নয়। এই প্রসঙ্গে কবি কৌশলে বিরহান্তরিতা কোন নারীর সীমান্তের কথা মনে করিয়ে দেয় - সিঁদুর তাঁর সীমান্তে সত্যি ছিল কিংবা থাকতে পারতো, তা অবশ্য বলা নেই। কবিতার দ্বিতীয় স্তবক শেষ হচ্ছে প্রথম পংক্তির এই রূপান্তরের মাধ্যমে -

"খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।"

এখানে 'তাকে' -র স্থানে 'যাকে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ চকিতে একবার গলির প্রান্তে লাল আভার দুরন্ত সিঁদুরে একবার তাকে বোধহয় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে তাঁর পরেই বৃষ্টি নেমেছে। তাই তাকে খোঁজা বৃথা। অভিজ্ঞানও বৃথা। যে ছিল এতক্ষণ প্রত্যক্ষ সে দূরে চলে গেছে। তাই এখন 'তাকে' নয়, 'যাকে'। কোন বিশেষ কারোর জন্য যে কাতরতা, হাওয়ার মুখে তা অবিশ্রাম ঘোষিত সামান্য বিচ্ছেদ বেদনায় পরিণত হয়েছে। এ বেদনা চিরকালীন। সে কথা দিয়েই কবিতার শেষাংশের শুরু -

"আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।"

এর পরের অংশের ব্যাখ্যা কবি অমিয় চক্রবর্তী নিজেই দিয়েছেন একটি লেখায়, এই ভাবে -

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
94

"কবিতার বাইশ পঙক্তিতে 'সেই' কথাটা ব্যবহৃত হল সর্বপ্রথম সৃষ্টিক্ষণের উদ্দেশ্যে, যেখানে আদি প্রৈতি, বৃষ্টিরও সৃষ্টিরও ; মানুষের দুঃখানুভূতির পূর্বসূচনা সেইখানে। যদিও সচেতন কাল এল পরে, মানুষের সৃজনভূমিতে, সংসারে। 'মৃত্তিকার সত্তা'কে 'স্মৃতিহীনা' বলা হয়েছে কেননা স্মৃতির শুরু চৈতন্যে ; অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যে। যাকে বলা হয় প্রকৃতি তাতে সেই বোধের প্রমাণ নেই যদিও প্রসঙ্গ আছে, না হলে

মানুষ ভিজে আকাশ, বর্ষার মাঠে তাঁর বেদনা নিয়ে দাঁড়াত না। বৈদিক পুরুষসূক্তের প্রভাব মেনেছি - যদিও আমার সামান্য এবং ক্ষীণ কাব্যে তাঁর প্রতিধ্বনিটুকুও পৌছয় নি। প্রেমের অনুরঞ্জিত মুহূর্ত নিয়েই এই লিরিকের বিস্তাঁর।

'প্রশস্ত, প্রাচীন' সেই সামগ্রিক সত্তা যা মানুষের অধিকার ছাড়িয়ে আছে অথচ যা মানবচেতনার যুক্তাধিকারে আমাদের কাছে অর্থময়, পূর্ণতাঁর ব্যঞ্জনাময় । ..... বৃষ্টির ধারাবর্ষণে যে - বেদনা নেই তাকে মিশ্রিত করি আমাদের বেদনায় - হঠাৎ দাঁড়াতে চাই সত্যসত্যই যা বর্ষাজল তাঁরই কাছে। মানুষ দুঃখ চায়, সুখ চায় কিন্তু সীমানা - বহির্ভূত বোধকেও হারাতে চায় না।"

যাইহোক, কবিতার শেষ অংশে যে কথা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তা হল একদা যা ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঁর অন্তর্গত, আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে গুহার আঁধারে রচিত চিত্রকলায়। গুহা হৃদয়ের সমার্থক হতে পারে। জীবন এই ভাবে শিল্পিত হয়ে ওঠে। তবু পৃথিবীর আদিম বর্ষণ জল, হাওয়ার দৌরাত্মে সেই প্রথম বেদনা ফিরে ফিরে হৃদয়ে হানা দেয়, পরিণামে যদিও সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক সেই অভিজ্ঞতাঁর আঘাতে শান্ত হয়, পবিত্র হয়। কান্না দিয়ে ধুয়ে মুছে তুলে রাখার সেই প্রক্রিয়া থেকে কবিতার জন্ম।

এই কবিতাটির আরেক রকম ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, একটি বিশেষ নামকে ঘিরে এই ব্যাকুলতা। লেখক এ কবিতায় দেখতে পান এক চিরকালের বেদনা। বৃষ্টি - জল, হাওয়া - পৃথিবীর এই বস্তুগুলি আদিম। এ বৃষ্টিকে কবির কান্নার মতো মনে হচ্ছে, এ হাওয়াকে মনে হচ্ছে 'তমস্বিনী' এই বৃষ্টি। হাওয়া কবির শুধু একলারই নয়। অহংমুক্ত হতেই কবি দেখতে পেলেন, প্রবল বর্ষণে মত্ত, মুগ্ধ হয়ে উঠেছে বিশ্বপ্রকৃতি - যেমন হয়েছে চিরকাল, সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ থেকে। বিরহ তাকে স্পর্শ করে না। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত কোন স্থির বিন্দু নয়, তা চলমান স্রোতোধারার মতো, 'মৃত্তিকার সত্তা' তাই 'স্মৃতিহীনা'।

এরপর 'বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে .....' অংশে কবির উদ্বেল আবেগ যেন শান্ত হল অহংমুক্ত প্রজ্ঞার প্রভাবে। চৈতন্য তাই 'আর্দ্র' হলেও 'স্তব্ধ'। স্রোতস্বনা সৃষ্টির অনাদি উৎস পর্যন্ত যে - বিস্তৃত কালে কবির দৃষ্টি প্রসারিত তাই 'প্রশস্ত প্রাচীন', বিচ্ছেদরহিত বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে কবির ব্যক্তিগত বিচ্ছেদবেদনা স্তিমিত হল বলেই, তখনই, বহির্দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিতে গুহাচিত্রের মতো সুন্দর ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে দেখা দিল।

কিন্তু শান্তি বেশিক্ষণ টেঁকে না। ঝোড়ো হাওয়া শূন্যতাঁর হাহাকার জাগিয়ে তোলে আবার, প্রজ্ঞাকে পরাভূত করে হৃদয়। বর্ষার জলধারায় যে পলাতককে পেতে ইচ্ছে হয় অথচ শত কান্নাতেও পাওয়া যায় না, সে ঐ ঘনমেঘের গভীরে কোথাও আছে - এমনি একটা ব্যর্থ সান্ত্বনায় কবিতা শেষ হয়। সবশেষে আবার প্রথম পংক্তির প্রত্যাবর্তনে কবিতাটি একটি

টিপ্পনী

নিটোল গীতিকবিতা হয়ে ওঠে, আর কান্নার মতো 'বৃষ্টির' ধারাপতনে ভিজে যায় পাঠকের মন।

আমি কবি যত কামারের :

টিপ্পনী

কল্লোল যুগের এক অনন্য সাধারণ শিল্পী হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সরলতা, স্পষ্টতা প্রভৃতি তাঁর পদ্য এবং গদ্যের সাধারণ গুণ। তিনিই চিরকাল ভগ্ন হৃদয়ে উৎপীড়িত লাঞ্ছিতদের জন্য স্বর্গের অনুসন্ধান করেছেন। সে অনুসন্ধান কখনো কখনো অপরিণত হলেও তাতে স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। তবে তাঁর বিশিষ্ট কবিতাগুলি সবই প্রায় ১৯২৪ - ২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি যে সময়কালে বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করলেন তখনকার সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল অস্থির। এই অস্থিরতাঁর চিত্রই নানান ভাবে নানা কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সমাজ সমস্যা, কঠোর বাস্তবতা, কর্মী - মানুষদের নিত্য দিনকার কথা প্রভৃতিও তাঁর কাব্যের বিষয় হয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'আমি কবি যত কামারের' কবিতায় কবি দরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদেরই একজন হয়ে। আমরা এখন এই কবিতাটি বিশ্লেষণে সচেষ্ট হবো।

আটটি স্তবকে সমাপ্ত এই কবিতাটি আমাদের দেশের জন-জাগরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজে যারা উপেক্ষিত, অবহেলিত সেই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষেরই তাঁর এই কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাদেরকে কবি শুধু কাব্যের বিষয় হিসাবেই এ কবিতায় দেখেন নি, কবি তাদেরই একজন প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করে কাব্যারম্ভে বলেছেন -

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
- আমি কবি যত ইতরের!"

কবির সমস্ত ভাবনা জুড়ে আছে এই শ্রমজীবী মানুষেরা। সেখানে স্বপ্নের চোরা বালিতে ভেসে যাওয়াকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। অন্যান্য যে সমস্ত কবিরা রোমান্টিক ভাবনা দ্বারা আচ্ছন্ন তাঁদের উদ্দেশ্যে তাই তাঁর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি -

"বিলাস - বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই,"

শ্রমমুখর, মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত সাধারণ মানুষের ধর্মই হলো নিরলস কর্মপ্রবণতা। কবি সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে এই সাধারণ মানুষগুলোকে দেখেছেন। অর্থাৎ স্বপ্নের আবেশে জীবন কাটানো জীবনের মূল মন্ত্র নয় - চিরন্তন গতিময়তাই জীবনকে কাল

থেকে কালান্তরে প্রবাহিত করে। এই ভাবনায় আরূঢ় হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলে ওঠেন 'দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাধা যে পড়িতে চায়'। এর পরপরই কবিতাটিতে তিনি সকল শ্রমিক মানুষকে উপলব্ধি করেছেন নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে। তাই তিনি কখনো হয়ে ওঠেন কুম্ভকার, কখনো বা বাস্তবের মাটিতে পা রেখে আকাশে উড়ে চলা দুঃসাহসী মানুষ। এই অবিরাম কর্মময় জীবনে বিলাস বৈভবের কোন স্থান নেই, নেই কোন কাল্পনিকতা। তাই জীবনকে অলস করে দিতে পারে এইরকম ঋণাত্মক (নেগেটিভ) ভাবনাকে তিনি কার্যত এই কবিতায় ব্যঙ্গই করেছেন। জাফরি কাঁটা জানলা গলে জ্যোৎস্নার আলোকমালা, প্রিয়ার কোল এ সমস্ত কিছু কবির কাছে জীবনের শ্লথ গতিরই নামান্তর। শুধু তাই নয় দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত প্রিয়ার দুটি চোখের কোলে যে দু'ফোঁটা অশ্রুজলের মধুর মিনতি দোলে, সে মিনতিকেও কবি পেছনে ফেলে 'চরৈবেতি'র মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এগিয়ে চলেন। কবি জীবনের অর্থ খুঁজে পান -

"বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই!"

অর্থাৎ যেখানে হাজার হাজার বিশ্বকর্মার হাতে গড়া হাজার হাজার কাজ, তাদের কথাই কবি চারণ কবি সেজে দেশে - দেশান্তরে গেয়ে যেতে চান ; গেয়ে যেতে চান কর্মের জয়গান।

কবি যে আন্তরিক ভাবেই মানুষের একজন হয়ে উঠেছেন তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনি যখন বলেন -

"আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
- আমি কবি যত ইতরের।"

এই যে হীনতাঁর ও দীনতাঁর পাশে এসে দাঁড়ানো, এর মধ্যে আতিশয্য অবশ্য আছে, কিন্তু এর ঠাট বা পোজ উগ্র নয়। এই দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান নি বরং দুঃখ-দারিদ্র্যকে জীবনের একটি সহজ সত্য হিসাবে মেনে নিয়ে এখান থেকেই জীবনানন্দ খুঁজে নিতে চেয়েছেন। কামারের সাথে হাতুড়ি পিটিয়ে, ছুতোরের তুরপুনে হাত লাগিয়ে 'কোন সে অজানা নদী পথে' জোয়ারের মুখে গুণ টেনে তাদের সঙ্গী হয়ে নতুন পথে চলেছেন। আবার তাঁর কোন এক বন্ধুর সাথে পাল তুলে পাড়ি দিয়েছেন সাগরে কিংবা হাল ফেলেছেন দরিয়ায়। এই সমস্ত দুরূহ কাজকে তিনি এড়িয়ে যান নি , চেয়েছেন পেরিয়ে যেতে। তাই কঠিনতম কাজকে তিনি অতি সহজেই জীবনে বরণ করে নিয়েছেন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"কোন সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
কুঠার ঘায়।"

সর্বোপরি কবি সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্মক অনুভব করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত মেহনতি মানুষের কর্মপ্রবাহকে একত্রিত করলে দেখা যায় সেখানে কোন অবসরের অবকাশ নেই। নেই কোন স্বপ্নের জগৎ : আছে শুধু কাজ আর কাজ। যে কাজ সব সময় পৃথিবীকে গড়েই চলেছে। খোয়া ভেঙে, খাল কেটে নতুন পথ বানিয়েই চলেছে। এ কাজে বিরাম নেওয়ার বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নেই। তাই কবিতাটির একেবারে শেষে কবি বলেছেন -

স্বপ্নবাসরে বিরহিনী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই!"

কবিতাটির নামকরণে কবি 'যত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'যত' শব্দটির ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত আমদের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু কবিতাটির শেষ স্তবকের একেবারে শেষের দিকে এই 'যত' শব্দের বিস্তাঁর সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা পাই। অর্থাৎ কবি পৃথিবীর সমস্ত মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের কবি হয়েও তাদের বন্ধুই হয়েছেন সর্বাগ্রে। তাদের ছোট ছোট দুঃখ, আশা সব কিছুকেই ভাগ করে নিয়েছেন, কবি তাদের সঙ্গে থেকে। এই বিশ্বাত্মবোধ বিশেষত নীচু তলার মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব - এই বিষয়টিই কবিতাটিকে শিল্পসার্থক করে তুলেছে। পাশাপাশি কবিতাটির স্বাতন্ত্রতাও চিহ্নিত হয়েছে।

খুকু ও খোকা : অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি, চিন্তাবিদ। উনিশ শতকের বাঙালী রেনেসাঁ ঐতিহ্যের শেষ বুদ্ধিজীবী হিসেবে অভিহিত। জন্ম উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলের এক শাক্ত পরিবারে। যদিও তাঁদের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোতরং গ্রামে। কর্মসূত্রে উড়িষ্যায় আসা। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জমিদার। তাঁদের পরিবারে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা হ'ত প্রতিনিয়ত। পিতামহ শ্রীনাথ রায়, পিতা নিমাইচরণ রায় ও কাকা হরিশচন্দ্র - এঁরা সবাই ছিলেন সাহিত্যরসিক। শিল্প - সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। নিমাইচরণ রায় তাঁর এক বন্ধুর সহযোগিতায় 'শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' অনুবাদ করেন ওড়িয়া ভাষায়। মাতা হেমনালিনী ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাদর্শে বিশ্বাসী এবং কটকের বিখ্যাত পালিত পরিবারের সন্তান। এমন পরিবারে প্রাচ্য - পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্র পরিবেশে কেটেছে

অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবন।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ঢেঙ্কানলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হয়। ১৯২১ সালে ঢেঙ্কানল হাইস্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তাঁরপর তৎকালীন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কটক র‍্যাভেন্স কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৩ এ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ এ ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ইংরেজি নিয়ে এম এ পড়াকালীন ১৯২৭ সালে অন্নদাশঙ্কর আই. সি. এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে প্রশিক্ষণ নিতে ইংল্যান্ড যান। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসে ১৯২৯ সালে অন্নদাশঙ্কর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কখনো পশ্চিমবঙ্গে কখনো পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ শেষ হলে তিনি উচ্চতর পর্যায়ের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের (আই. এ. এস) সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও বিচার বিভাগে কাজ করেন। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৫১ সালে তিনি স্বেচ্ছাবসর নেন।তাঁরপর তিনি শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তাঁর বাড়িতে নিয়মিত 'সাহিত্য সভা' হত এর পর ষাটের দশকে পারিবারিক কারণে কলকাতায় এসে বসবাস করেন। সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান।

অত্যন্ত মেধাবী অন্নদাশঙ্কর কুড়ি বছর বয়সে প্রথম ওড়িয়া সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে বহুভাষায় পারদর্শী অন্নদাশঙ্কর শেষপর্যন্ত বাংলাতেই সাহিত্যচর্চা করেন। একদিকে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' অন্যদিকে টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে টেনে আনে সাহিত্যের পরিসরে। ১৬ বছর বয়সে টলস্টয়ের গল্প 'তিনটি প্রশ্ন' তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। 'প্রবাসী' তে সেটি ছাপা হয় ১৯২০ সালে। বাংলাতে তাঁর প্রথম প্রকাশিত মৌলিক রচনার বিষয় ছিল নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা, যা 'ভারতী'তে ছাপা হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের যে সমালোচনা তিনি লেখেন তা স্বায়ং রবীন্দ্রনাথকে আলোড়িত করে। তবে বাংলা সাহিত্যে তিনি নিজের স্থান করে নেন 'পথে প্রবাসে' ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে।

দীর্ঘজীবী (১৯০৪ - ২০০২) এই লেখক প্রায় সত্তর বছর ধরে প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, ছড়া, কবিতা, নাটক, পত্রসাহিত্য, আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রভৃতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর এই বিচিত্র ধরনের সাহিত্য সম্ভার কেবল আঙ্গিকে নয়, ভাববৈচিত্র্যেও কালোত্তীর্ণ।

তাঁর বাংলা ছড়াও বিষয় বৈচিত্র্যে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ এবং পরে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তিনি ছড়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন। সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় থেকে শুরু করে প্রাণী জগতের ক্ষুদ্র জীবজন্তুও তাঁর ছড়ার বিষয় হয়েছে। তীব্র শ্লেষে, স্নিগ্ধ পরিহাসে, আবার কখনো নিখাদ কৌতূকে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরেছেন তাঁর ছড়ায় । একসময়ের ছেলেভুলানো ছড়াকে তিনি উপেক্ষিত স্তর থেকে উন্নীত করেন অভিজাত সাহিত্যের শৈল্পিক স্তরে । তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছড়া 'খোকা ও খুকু' (১৯৪৭) । এতে সুর দিয়েছেন বিখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী। দেশবিভাগজনিত বেদনা তীর্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই ছড়ায়। তাঁর বেশ কিছু ছড়া প্রতিষ্ঠিত সুরকারদের সুরে এভাবে জনপ্রিয় গানে রূপ পেয়েছে। এছাড়া অন্নদাশঙ্করই বাংলায় প্রথম লিমেরিক রচনা করেন। আধুনিক বাংলা ছড়ার যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাঁর সূত্রপাত করেন অন্নদাশঙ্কর। তাঁর প্রধান ছড়ার বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'উড়কি ধানের মুড়কি' (১৯৪২), 'রাঙা ধানের খৈ' (১৯৫০), 'ডালিম গাছে মৌ' (১৯৫৮), শালি ধানের চিঁড়ে' (১৯৭২), 'আতা গাছে তোতা' (১৯৭৪), 'হৈ রে বাবুই হৈ' (১৯৭৭), 'ক্ষীর নদীর কূলে' (১৯৮০), 'হট্টমালার দেশে' (১৯৮০), 'ছড়াসমগ্র' (১ম সংখ্যা ১৯৮১), রাঙা মাথায় চিরুণি' (১ম সংখ্যা ১৯৮৫), 'বিন্নি ধানের খই' (১৯৮৯), 'কলকাতা পাঁচালী' (১৯৯২), 'ছড়াসমগ্র' (২য় পরিবর্ধিত সংখ্যা ১৯৯৩), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৯৪), 'খেয়াল খুশির ছড়া' (১৯৯৭), 'দোল দোল দুলুনি' (১৯৯৮) ইত্যাদি।

সাহিত্যকর্মের জন্য অন্নদাশঙ্কর রায় বহু পুরস্কারে ভূষিত হন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তাঁরিণী' পুরস্কারে ভূষিত করে ১৯৯৭ সালে । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম সম্মান প্রদান করেন। বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি দেন। এছাড়া অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬২), আনন্দ পুরস্কার (২বার - ১৯৮৩, ১৯৯৮), বিদ্যাসাগর পুরস্কার , শিরোমণি পুরস্কার (১৯৯৫), রবীন্দ্র পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার ইত্যাদি।

আমরা এখানে তাঁর 'খুকু ও খোকা' (১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করবো।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
100

কবি এই ছড়াটি লেখেন ১৯৪৭ সালে । ছড়াটিকে প্রায় Prophetic বা ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ছড়া বলা যেতে পারে। কারণ এই ছড়াটি লেখার পর পরই দেশভাগ হয়। লোকমুখে প্রচলিত হতে হতে ছড়াটি পরে প্রবাদতুল্য হয়ে পড়ে। এতই জনপ্রিয় হয় যে, পরে তা সলিল চৌধুরীর সুরে গানও হয়। যাইহোক এই ছড়াটি রচনার পেছনে একটি নির্দিষ্ট কারণ ছিল। সে কারণ খুঁজতে গেলে তাঁর 'সেতুবন্ধন' (১৯৯৪) প্রবন্ধের দিকে তাকাতে হয়। সেখানে তিনি লেখেন -

" ভারতভাগ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলো না। কিন্তু বাংলাভাগ ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ঘটনাটা একবার ঘটে যাওয়ার পর তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য গতি ছিল না। বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিলে কী হবে, অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারিনি। হৃদয়ে যে বেদনা ছিলো, সে বেদনা এখনও রয়েছে।"

এই দেশভাগের বেদনাই ঝরে পড়েছে ছড়া হয়ে। দেশভাগের বেদনা থেকে অনেক কবিতা - উপন্যাস গল্প হয়েছে। কিন্তু চারটি অব্যর্থ লাইনে এমন অনবদ্যভাবে দেশভাগের অযৌক্তিকতাকে মনের ভেতরে গেঁথে দিতে আর কিছু পেরেছে কি ? -

"তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো !
তাঁর বেল ?"

অন্নদাশঙ্কর বরাবর ভেবেছেন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যত সুদৃঢ় হবে ততই একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে। আর তা হবে তখনই যখন দেশ টুকরো হওয়া বন্ধ হবে। ভাঙাভাঙি বন্ধ হবে। তাই তিনি এই রাজনৈতিক ফায়দার কারণে দেশের মধ্যে ভাঙনকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেছেন -

"ভাঙছো প্রদেশ ভাঙছো জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি !
তাঁর বেলা ?"

এই ভাঙনের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি জাতির মানসিকতাঁর চিত্র এঁকেছেন। আমাদের অসহিষ্ণুতাঁর ফলে আমরা চারিদিকে সব ভেঙে চলেছি। গড়ছি না কিছুই। আমরা আন্দোলনের নামে ভাঙছি, প্রতিবাদের নামে ভাঙছি। এ ভাঙাভাঙিতে সর্বস্তরের মানুষই প্রায় সামিল। এ ভাঙন রোগ সমাজের বুকে এমন ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে যে তা এক ভয়ানক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, সমাজে, রাষ্ট্রে। তাই এমন আক্ষেপ -

"ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির - লুট !"

কোথাও কবি গঠনের আশ্বাস পান না। চারিদিকে ধ্বংসের ছবি। এই ভাঙন, বিচ্ছিন্নতা একটি জাতির মর্মমূলে। সে কথা ভেবেই তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। এ কাজ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যারা করছেন তাঁরা কেউ ছোট নয়। তাঁরাই দেশের ধারক - বাহক। তাঁরাই সমাজের গুণীজন । কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবাই সামিল। এ ভাঙন দেশের পক্ষে, রাষ্ট্রের পক্ষে কোন দিন মঙ্গল সূচক হতে পারে না। তা ক্রমশ দেশকে পিছিয়ে দেয়। বিশ্বের দরবারে। আমাদের ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যায়, এ কবিতা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আজ খুবই প্রযোজ্য। ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড রাজ্য। অর্থাৎ একটি বড় রাজ্য ভেঙে দু-টুকরো করা হয়েছে। তাতে আসলে একটি রাজ্যের মধ্যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যাচ্ছে, অন্য রাজ্য বঞ্চিত হচ্ছে। এতদিন একই রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় একটা সমতা বজায় ছিল। এখন ভাঙনের ফলে ক্রমশ এই অসমতা বাড়ছে। তাতে সামগ্রিক ভাবে দেশেরই ক্ষতি হচ্ছে । তা আমরা বিহার-ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড় কিংবা অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা দেখলেই বুঝতে পারি। এ কথা অন্নদাশঙ্কর বাংলা ভাগের প্রেক্ষিতে বললেও আজও আমরা সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারলাম না । তাই এই জাতি যে আত্মঘাতী জাতি তা বলতে দ্বিধা নেই।

কবি অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন এ কথা দুটো বিপরীত চিত্রের তুলনার মধ্যে দিয়ে। ছোট শিশুরা যা পায় তাই ভাঙে কিন্তু তা তো না জেনে, না বুঝে এবং তা সমষ্টির ক্ষেত্রে কোন বিরূপতা সৃষ্টি করে না। কিন্তু আমরা যখন ভাঙাভাঙিটা ব্যক্তিজীবনের দৈনন্দিন চর্চার মধ্যে নিয়ে আসি তখনই তা বৃহত্তর স্বার্থবিরোধী হয়ে পড়ে। কবি তাই এক গভীর সমস্যাকে ছড়ায় বলেন -

"তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর' পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো!
তাঁর বেলা?"

এখন আবার গোর্খাল্যান্ডের দাবী উঠছে। আমরা কবে বুঝবো কবির মতো কর ? কবে বন্ধ হবে এই ভাঙাভাঙির খেলা! রাজনীতি!

চিল্কায় সকাল : বুদ্ধদেব বসু

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী
102

'চিল্কায়' সকাল কবিতাটির আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে জেনে নিই, স্বয়ং কবি কবিতাটি সম্পর্কে কি বলেছেন -

"চলতি মুহূর্তের কবিতা বলতে কি বুঝি তাঁর একটা উদাহরণ দিই। চিল্কায় সকাল কবিতাটি সত্যই চিল্কার ধারে বসেই লিখেছিলেম, সত্যি এক সকালবেলায় - আমার জীবনের নিবিড় এক আনন্দের মুহূর্তে । যেন মুহূর্তটিকে হাতে হাতে গ্রেপ্তাঁর করে

ফেলেছিলাম, তাঁর সব সবুজ গন্ধ আর সজলতা সুদ্ধু - তাকে শুকিয়ে যাবার সময় না দিয়ে, নিজেকে অন্য কোন দিকে ফিরে তাকাবার সময় না দিয়ে। ..... চিল্কায় সকাল - এ যা কিছু আছে সবই সেই মুহূর্তে দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েছিলো।" (কবিতার শত্রু ও মিত্র : বুদ্ধদেব বসু)

বোঝাই যাচ্ছে কবিতাটি একটি বিশেষ মুহূর্তকে কেন্দ্র করে। সে প্রসঙ্গে আসার আগে কবিতাটির তথ্যগত দিক একটু জানা যাক।

'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি 'নতুন পাতা' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটির রচনার শেষে স্থান ও কালের উল্লেখ করা হয়েছে ১১ নভেম্বর ১৯৩৪, চিল্কা। সাতটি স্তবকে সমাপ্ত এ কবিতা। প্রথম স্তবকটিতে মাত্র দুটি পংক্তি - কবিতার ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত। ২৯ পংক্তির এ কবিতার ধ্রুবপদ হ'ল - 'কেমন করে বলি'।

'চিল্কায় সকাল' কবিতাটিই একই সঙ্গে সৌন্দর্য ও প্রেমের কবিতা। কবির কাছে চিল্কায় সকাল অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত যেন এক শিল্পিত সৌন্দর্যের বিকাশ। এই সৌন্দর্যের শিল্পী হল কবি প্রিয়ার প্রতি কবির অপার ভালোবাসা। কবি এখানে প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারী। নিসর্গের এক আশ্চর্য মায়াময় পরিবেশ প্রেমিকার ঘন সান্নিধ্যে কবি প্রেমের পরিপূর্ণতাঁর আনন্দানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কবির আবেগ, উত্তাপ, চেতনা রোমাঞ্চ শিহরণে আবেগস্পন্দিত ভাষায় আবেশবিহ্বল কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কবিতায়। কবিতাটির মূল বক্তব্য - 'কেমন করে বলি'। সংহত অথচ আবেগপ্রবণ এই বাক্যাংশটি একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে।

কবির কাছে নিঃসীম, নির্মল নীলকাশের সৌন্দর্য অসহ্য সুন্দর - অর্থাৎ ভীষণ সুন্দর যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আবার কবি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পান আকাশ জুড়ে পরম স্তব্ধতা - যে স্তব্ধ আকাশ গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তানের মতো। কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা সবুজ পাহাড়, আর তাঁর মধ্যে ঝলকিত চিল্কার আলোছায়া এক মায়াময় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এমন এক নিসর্গ পরিমন্ডল থেকে নিবদ্ধ হয় প্রেমিকার প্রতি - এখানে কবি তাঁর প্রেমিকার গতিবিধির টুকরো টুকরো বিবরণ দেন -

"তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তাঁরপর গেলে, ওদিকে, ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে। গাড়ি চ'লে গেলো - কী ভালো তোমাকে বাসি, কেমন করে বলি।"

এখানে কবির প্রেমানুভূতির অনির্বচনীয়তা, গাঢ়তা এবং তীব্রতা নির্দেশিত হয়।

এরপর কবি আবার নিসর্গ পৃথিবীতে দৃষ্টি দেন। সেখানে দেখেন সূর্যের বন্যা। আবার তাঁর বিপরীত চিত্রও ধরা পড়ে। একপাল গরু এক মনে ঘাস ছিঁড়ছে শান্তভাবে। এখানে সীমা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এবং অসীমের ছবি এক রেখায় আঁকা। কবির এই সীমা - অসীমের ব্যঞ্জনাবোধের সঙ্গে আছে প্রেমিকা সম্পর্কিত অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির বিস্ময়াবিষ্ট সুখনুভূতি।

এরপর কবি আকাশ ও হ্রদের জলের অপরূপ মিলন লক্ষ্য করেছেন। কবির চোখে ধরা পড়েছে রুপোলি জলের শুয়ে শুয়ে স্বপ্নদেখা আর তাঁর বুকের ওপর সূর্যের চুম্বনে সমস্ত আকাশ নীলের স্রোতে ঝরে পড়া। এখানে তীব্র ইন্দ্রিয়বাসনার সংরাগ আছে ; আছে বিস্ময়বিহ্বল জিজ্ঞাসা -

"এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?"

এরপর কবি স্মৃতিচারণ করেছেন। কাল চিল্কায় নৌকায় যেতে যেতে কবি দেখেছিলেন দুটি প্রজাপতির উড়ে আসা - কবি আর প্রেমিকা সবিস্ময়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিলেন। তাদের সেই দুরন্ত দুঃসাহস কবি প্রিয়াকে হাস্যোদ্বেল করেছিল। দুটি প্রজাপতিকে উড়ে আসতে দেখার অপরূপ উপভোগ্যতায় সুখ সঞ্চারিত হয়েছিল প্রেমিকার দেহ - মনে - নয়নে। কবি তাঁরই বর্ণনা করেছেন। তাঁরপর কবি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন প্রেমিকার চোখে। সেখানে মানব সংসারের জন্মমৃত্যুর কত না রহস্য লুক্কায়িত। কবি তাঁর প্রেমিকার চোখে অনন্ত আকাশকে কম্পিত হতে দেখেন আর জীবনের অসীম রহস্য কবিদৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। প্রেমের এই সীমাহীন সৌন্দর্য, অতলান্ত রহস্য, সুদূরের বিস্ময়, ব্যাকুলতাঁর বেদনা, তৃপ্তিহীন স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের সহজতা, অন্তবর্তী গ্লানিহীন শান্ত সুখের অনুভব ইত্যাদি রোমান্টিকতাঁর বিশিষ্টতায় কবিতাটি দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

কবিতাটি মূলত একটি নিসর্গ - বিষয়ক কবিতা। কারণ চিল্কাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি কবির দৃষ্টিতে যে রূপে ধরা পড়েছে তাঁর বর্ণনাই এ কবিতার মুখ্য উপজীব্য। তবে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি প্রেমিকার উপস্থিতিতে একটি রোমান্টিক প্রেমের কবিতা হয়ে ওঠে। নারী ও প্রকৃতি একাকার হয়ে ওঠে। কবিতাটি বক্তব্যগত অর্থ ছেড়ে ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়। কবি তাঁর প্রেমিকার চোখে জন্ম-মৃত্যুর চকিত দ্যুতি লক্ষ্য করে শিহরিত হন -

"..... দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ। - আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম -
কেমন করে বলি।"

এখানেই কবিতাটি প্রেমের রসোত্তীর্ণতায় সার্থক হয়ে ওঠে। শাশ্বত প্রেমের হয়ে

ওঠে কবিতাটি।

সমগ্র কাব্যদেহ জুড়ে বিরাজিত চিল্কার সকাল। কাজেই এই চিল্কা হ্রদটি যেন প্রসারিত জীবনের চিত্রকল্পরূপে পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়। বহুদূর বিসর্পিত চলমান জীবনস্রোতে প্রেমের দয়িত-দয়িতার প্রতিমানরূপে দেখা দেয় দুটি দুঃসাহসী প্রজাপতি। সমস্ত পরিমন্ডলটি হয়ে ওঠে যেন 'স্বপ্নভঙ্গ'। সত্তাগত স্থূল আবরণ কবির চোখের সামনে থেকে বিদূরিত হয়; আন্তঃশায়িতা সত্তাঁর অপার্থিব আলোকে কবির চোখে উদ্ভাসিত হয় তাঁর 'পরমা'র 'উজ্জ্বল অপরূপ সুখ'। সত্তাঁর গহন গভীরে জ্বলে ওঠে শতসহস্র প্রেম প্রদীপের শিখা। কবি এসে পৌঁছোন সর্বাঙ্গীন আনন্দসত্তাঁর গভীরতম প্রান্তে। রোমান্টিকতাঁর অনুভূতিতে। প্রকৃতি ও মানবী মিলে মিশে এক অত্যাশ্চর্য প্রেমের কবিতা হয়ে ওঠে এই 'চিল্কায় সকাল' কবিতাটি। একটি চলতি মুহূর্তের কবিতা যে এমন অনন্ত মুহূর্তে পরিণত হতে পারে তা কবির নিজস্ব মুন্সিয়ানা না থাকলে হয় না।

টিপ্পনী

অমরতাঁর কথা : অরুণ মিত্র :

আধুনিক বাংলা কবিতায় চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি অরুণ মিত্র। যশোরের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কবি। বাল্য ও কৈশর যশোরে কাটিয়ে কলেজে পড়বার সময় থেকেই তিনি কলকাতায়। কিছুদিন (১৯৩১ - ১৯৪২) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সাংবাদিকতাঁর কাজ করেন। পরে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নেবার জন্য চলে যান প্যারিসে। সেখান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফেরেন।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে অরুণ মিত্র মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ। জীবনরসে মত্ত। আত্মধ্যানে মগ্ন। তবে সময়ের অভিঘাত তাঁর কবিতাতেও ধরা পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্নীতি, বেকারত্ব, কালোবাজারী, পুঁজিবাদের আগ্রাসন, মানবত্বের ক্রমাবনমন এসব চল্লিশের কবিদের কবিতার বিষয়। তবে শুধু এই নৈরাশ্যময় চিত্রই ধরা পড়ে নি। তাঁর থেকে মুক্তির বার্তাও দিয়েছিলেন কবিরা। নিরুপায় আত্মসমর্পণ ও মৃত্যুর গ্রাস থেকে মুক্তির ইশারা মিলেছিল সোভিয়েতের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে। এর মধ্যে দিয়েই রচিত হ'ল মানবমুক্তির স্বপ্ন, ঝংকৃত হ'ল আশাবাদী সুর।

স্ব - অধ্যায় সামগ্রী

জার্মানী - জাপান-ইতালির ভয়ংকর ফ্যাসিবাদী আক্রমণে পিষ্ট-দলিত হওয়াই যে মানবতাঁর শেষ কথা নয়, সম্মিলিত মানবাত্মার বিজয়ই যে অবশ্যম্ভাবী, সেই আশাবীজ সোভিয়েত বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনা তৎকালীন মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবিবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে কবি অরুণ মিত্রকেও দিয়েছে এক শান্ত অচঞ্চল বিশ্বাসের ভূমি। তাই তাঁর কবিতায় এল সংহত উচ্চারণ, বাহ্যদৃষ্টির বাহুল্য থেকে শোনা গেল আত্মসন্ধানের আর্তি, নৈরাশ্যের

টিপ্পনী

কুহেলিকা ভেদ করে সদর্থক চেতনা বিকাশের উজ্জ্বল সুর। আমরা তাঁর 'অমরতাঁর কথা' কবিতার দিকে তাকালে এ সত্য সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তিনি এতটাই আশাবাদী যে বলেছেন -

"বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তাঁর ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এই খানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিলো।"

অর্থাৎ একটা বেসুরো জিনিস থেকেও সুর উৎপন্ন হবে। সাংগীতিক শৃঙ্খলা তৈরী হবে। সমতা আসবে জীবনে - যুগে। এখন যার ভারি অভাব। চারিদিকে হাহা কার, হতাশা, নিরাশা, কিন্তু সময় পাল্টাবে। গোটা পৃথিবী জুড়ে এই প্রশান্তি বিরাজ করবে।

বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা, বেকারত্ব, দুর্নীতি, কালোবাজারী, ফ্যাসিবাদ, মৌলবাদের পাশবিকতায় কবি যেমন ক্রোধে, ঘৃণায় শিহরিত হন, তেমনি সোভিয়েতের মধ্যেই দেখতে পান মানবমুক্তির ইশারা, শুনতে পান নবপ্রভাতের অনুচ্চ ভৈরবী সুর। তাঁর কবিতায় তাই মিশে যায় চড়া ও স্নিগ্ধ বর্ণ, কড়ি ও কোমল সুর। কখনো তাঁর কবিতা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে ওঠে, আবার কখনো হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ কল্যাণময় সাঁঝবাতি। উঠে আসে সবুজ পৃথিবীর সুখ। শুধু মৃত্যুর আবহ নয়, তাঁরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে জীবনের বীজ। ধ্বংস হবে সব বাঁধার প্রাচীর। এ সবই কবির কল্পনা। এই স্বপ্নেই তিনি গোটা পৃথিবীকে একসূত্রে মেলান। -

"আমার বন্ধ বাতাসে যে গান - পাষাণ হয়ে থাকে তা ভেঙে ছিটিয়ে পড়ুক, কল্পনার স্বর সমুদ্র হোক এই আশায় আমি অথই। অবিশ্রাম অনুরণনে পাঁচিল ধ্বসে যাবে, কলরোলে, ভিটেমাটি তলাবে। তখন ঘূর্ণির পাকে বুঝে নিয়ো কোথায় সেই বিন্দু যেখান থেকে জীবন ছড়িয়ে পড়লো মৃত্যুর গহ্বরে।"

ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন ও মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কবি কমিউনিজমে দীক্ষিত করেছিলেন নিজেকে। তাই বিশ্বমানব মুক্তির স্বপ্ন তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল উজ্জ্বল বর্ণে। "শান্তির শিশির - মুক্তা -ঝলমলে এক পৃথিবী তিনি চেয়েছেন, যেখানে মানুষের উচ্ছল বেঁচে থাকার স্রোতে উচ্ছাসের সমস্ত আলো জ্বলে ওঠে। পৃথিবী, ধুলো, নদী, ফসল, ধানশিষ, অশ্বারোহী সেনা ইত্যাদির সমারোহে তাঁর কবিতা এক অন্তর্লীন মগ্নতাঁর জগৎ গড়ে তোলে। তিনি নিজের কাঙ্ক্ষিত পৃথিবীর অজস্র রূপ দেখতে দেখতে একসময় বিভোর হয়ে যায়। সেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপনে আগ্রহী অরুণ মিত্রের চারপাশে ক্রমে ঘনিয়ে আসে ধুলো - মাটির গান।" - এ কথা বলেছেন কবি ও প্রাবন্ধিক জহর সেন মজুমদার। আমরাও দেখি যে, তিনি প্রকৃতির কাছে ফিরে যাচ্ছেন, কংক্রীটের দেয়াল,

অট্টালিকা নগর সভ্যতাঁর কলুষ মুক্ত হতে চাইছেন মনে প্রাণে। বাস্তবিক অজস্র মৃত্যুর মধ্যেও তিনি অমরতাঁর মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন অবিশ্রাম। তখন আমরা ভাবতে বাধ্য হই তাঁর মতো করে, যখন তিনি উচ্চারণ করেন -

"ওরা আবার বণ্য হয়ে উঠবে। আমার ছাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভরে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি, সেখানে পোড়ামাটি ইতর ভিতরে রস ছিলো অমৃতের মতো।"

এ কবিতা মূলত লেখা হয় টানা গদ্যে। চল্লিশের দশক থেকে নিয়মিত এই আপাত অ-ছন্দিত কবিতায় বার্তালাপের সুরে জনজীবনের এই যে রূপ উন্মোচন করেছেন অরুণ মিত্র তা চল্লিশের দশকের কবিতা থেকেই আমাদের সম্পদ হয়ে আছে।

কবি, প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক জহর সেন মজুমদারের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় উঠে আসে যে, কবিতাটির দুটি পর্যায়। একটি হ'ল সংসার - ঘরকন্নার দিক। অন্যতি সবুজ বন-প্রকৃতির দিক। প্রথম দুটি স্তবকে আছে এই ঘর-সংসারের কথা। শেষ দুটি স্তবকে আছে, শ্যামল বনানীর কথা।

কেজো বাসনগুলো একদিন জানান দেবে হয়তো যে একদিন ঘর - সংসার ছিল। আসলে ভিটে -মাটির ওপর ঘর তৈরী হয় সেখানে জীবন শুরু হয়। মানুষ জন্ম নেয়। তাঁর লয় হয়। কিন্তু জীবনের মৃত্যু নেই। মাটিতে মিশে যায় মাটির শরীর কিন্তু জীবন অবিনশ্বর। তাঁর ধ্বংস নেই। সে আবহমানকাল ধরে প্রবহমান। তাই কবি বলেন -

"তখন ঘূর্ণির পাকে বুঝে নিও কোথায় সেই বিন্দু যেখান থেকে জীবন ছড়িয়ে পড়লো মৃত্যুর গহ্বরে।"

এরপরই কবি অরুণ মিত্র বলেন প্রকৃতির কথা। আমরা যতই প্রকৃতিকে ধ্বংস করি, 'কাঠকুটো আসবাব' করি , কিন্তু প্রকৃতিকে কি ধ্বংস করা যায় ? সে 'আবার বন্য হয়ে উঠবে"। ওদের মধ্যে কোথাও না কোথাওই লুকিয়ে থাকে 'অঙ্কুরের ঝাপটানি'। গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তাই যতই অন্ধকার, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা হোক না কেন, বনানী আবার জাগবেই, অঙ্কুরিত হবে। জীবনের জাগরণ ঘটবেই। প্রাণ সঞ্চারিত হবেই। অরণ্য আবার জাগবে। 'সবুজের প্রতাপে' শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। একটি ধ্বংস থেকেই আরেকটি সৃষ্টির অঙ্কুরোদগম হবে। আসলে জীবন অমর, অবিনশ্বর। তাই জহর সেন মজুমদার মনে করেন, কবিতাটিতে অপরাজেয় জীবন চেতনার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে হার না মানা নিরবচ্ছিন্ন জীবনের কথা। বলা হয়েছে জীবনের অমরতাঁর কথা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

উত্তরাধিকার : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত হয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরবর্তী পাঁচটি দশকে সাহিত্য চর্চা করেছেন ও শাসন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা - গল্প - উপন্যাস - ভ্রমণ কাহিনী সবেতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি। তবে পাশাপাশি একথাও বলতে হয় সুনীল মূলত ও প্রধানত কবি। 'নীললোহিত', 'সনাতন পাঠক' ও 'নীল উপাধ্যায়' ছদ্মনামে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। পেয়েছেন বহু সম্মান। ১৯৭২ এবং ১৯৮৯ সালে পেয়েছেন 'আনন্দ পুরস্কার'। ১৯৭৯ - তে আকাশবাণী থেকে জাতীয় পুরস্কার লাভ, ভারত সরকার প্রদত্ত স্বর্ণকমল পুরস্কার (১৯৮০), বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৮৩), সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সুনীল সঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪ - ২০১২) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল - 'একা এবং কয়েকজন' (১৯৫৭), 'আমি কিরকম ভাবে বেঁচে আছি' (১৯৬৫), 'বন্দী জেগে আছো' (১৯৬৮), 'দাঁড়াও সুন্দর' (১৯৭৫), 'মন ভালো নেই' (১৯৭৬), 'হঠাৎ নীরার জন্য' (১৯৭৮), 'স্মৃতির শহর' (১৯৮৩) , 'সুন্দরের মন খারাপ' (১৯৯১), 'সেই মুহূর্তে নীরা' (১৯৯৭), 'নীরা এবং নীরা (২০০০), 'ভালোবাসা খন্ড কাব্য' (২০০০) ইত্যাদি।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য কবিতাটি হল 'বন্দী জেগে আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'উত্তরাধিকার' কবিতাটি। এ কবিতাটিতে বহতা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মানুষের মানসিক বদলের ইতিহাসকে বলে যায়।আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছেপূরণ' গল্পটির কথা। বাবা সুবলচন্দ্র ও ছেলে সুশীলচন্দ্র মনে মনে ভাবে যে বাবা যদি ছেলের বয়স ফিরে পেত এবং ছেলে যদি বাবার মতো বড় হত তাহলে কত মজা হত। বাবা ছেলেবেলার ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতো এবং ছেলে বাবার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারত। একথা ইচ্ছেঠাকুরণ জানতে পেরে দু'জনের মনের ইচ্ছে পূরণ করেন। এতে বাবা ছেলের বয়সে নেমে যায় এবং ছেলে বাবার বয়সে পৌঁছে যায়। কিন্তু স্বভাব বদলায় না। বাবা ছোট হলেও বড়দের মত কথা বলে, আচরণ করে তাদের বিরাগ ভাজন হয়। আর ছেলে ছোটদের মত আচরণ করে সমস্যা সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আবার নিজেদের চেহারা ও জীবন ফিরে পান। এই গল্প থেকে বোঝা যায়, যে বয়সের যে ধর্ম, যে সময়ের যা দাবী তা মানুষকে পালন করতে হয় ; পূরণ করতে হয়। নইলে এ জগতে সমাজ, সংসারে বারে বারে বিপদে পড়তে হয়। সমাজে সংসারে সে বেমানান, খাপ ছাড়া হয়ে পড়ে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উত্তরাধিকার' কবিতাটিতেও এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সুবলচন্দ্র ও সুশীলচন্দ্র এই বাস্তব ঠেকে শিখেছে। সুনীল তাঁর কবিতায় জেনে বুঝেই নিজেকে বলে নিয়েছেন। যে বয়সে যে ধর্ম, তা অক্ষরে অক্ষরে পালণ করেছেন

সুনীল। মূল কথা হ'ল নতুনকে ছেড়ে দিতে হবে তাঁর জায়গা। না ছাড়লেই বিপদ। যে নিজে থেকে নতুনকে পথ ছেড়ে দেন, তিনি বরং সম্মানে বাকী সময় থাকেন। যে ছাড়েন না বা ছাড়তে চান না তাঁর অবস্থা তাঁরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'হাঁসুলীবাকের উপকথা' উপন্যাসের বনোয়ারীর মত হয়। করালীকে, নবীন কিশোরকে জায়গা ছাড়তে মোটেই প্রস্তুত নন বনোয়ারী। তাই করালী বাধ্য হয়ে বনোয়ারীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বনোয়ারীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। নতুন ক্রমশ পুরনোকে হারিয়ে, পরাস্ত করে নিজের জায়গা করে নেয়। আর এ কবিতার সুনীল নিজেই নবীনকে সাজিয়ে দিয়েছেন নিজের জীবনের পাথেয় দিয়ে। কবি নিজের ছোটবেলার ধর্মকে, উপাদানকে নিঃশেষে দান করেছেন কোন নবীন কিশোরকে। নির্মল আনন্দ, হাসি, সবুজপ্রান্তর, প্রকৃতি, দুপুর রোদের বেড়িয়ে বেড়ানো, রাত্রির মাঠে একলা থাকার অনুভূতি - সব, সব নবীন কিশোরকে দিয়েছেন। এই দিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন কুণ্ঠা নেই, নেই কোন কৃপণতা। সব উজার করে দিয়ে নবীন কিশোরের অনাগত জীবনের ভাঁড়ারকে পূর্ণ করে দিতে চান। -

"নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনভাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর ফুসফুস - ভরা হাসি
দুপুররৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকা
এ-সব এখন তোমারই, তোমার হাত ভ'রে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ ক্রোধ শিহরন"

কবি নবীন কিশোরকে শুধু গুণ দিয়ে আদর্শ মানুষ করতে চাননি। কারণ কবি জানেন মানুষ দোষে - গুণে। তাই শুধু গুণের কথা বললে, শুধু গুণকে দিতে চাইলে তা মানুষের ধর্ম পালন হ'ল না। মানুষ , একান্তই মানুষের কথা বলেছেন কবি। তাই মানুষ, মানুষকে যদি স্বভাব, ধর্ম, যাপিত সময়কে উপহার দিতে চান, তবে তো গুণের সাথে দোষও যাবে। তাই কবি সচেতন ভাবে তাও দিতে চান নবীন কিশোরকে। সিগারেট, প্রেম, কপির চুমুকের স্বাদ কবি যে ভাবে আস্বাদন করেছেন সেই আস্বাদনকে ও নির্দ্বিধায় দিতে চান। নবীন বয়সে ব্যাক্তিত্বের প্রথম প্রকাশ কবিতা লেখায়। সেই কবিতার কাছে আশ্রয়কেও দেন। আরো দেন -

"ছুরির ঝলক
অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত"

এতদিন তো অনেক গ্রহণ করেছেন তিনি। এবার তাঁর দেবার পালা। ত্যাগের পালা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এই তো পৃথিবীর চিরন্তন সত্য। শাশ্বত। ধ্রুব। এখন এ সব পুরোনো পোশাক ছেড়ে ফেলার সময় হয়েছে। এখানে মৃত্যুচেতনার কথা এসে পড়ে হঠাৎই -

"একখানা নদী, দু'তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী -
এ সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিলো, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর"

আমাদের আত্মা অবিনাশী, শরীর নশ্বর। আত্মা পুরনো দেহ ছেড়ে নতুন রূপে, নতুন সাজে, কোন না কোন ভাবে আবার প্রকাশিত হবে। এখানে তাঁরই প্রস্তুতি। এও এক সাম্যের চিন্তা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য। তাই কবি নতুনকে দিয়ে বিদায় নিয়ে নিতে চান। তাঁর দায়িত্ব নতুনের প্রতি যথাযথ পালন করে যেতে চান। তাই বলেন -

"তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।"

এই ত্যাগের মধ্যে দিয়ে আসলে এক মহৎ পার্থিব কর্তব্য পালনই কবি করেন। 'এ পৃথিবীকে নবীনের 'বাসযোগ্য' করে যেতে চান কবি এ কবিতায়। উত্তরাধিকার সূত্রে নবীন তা পেয়ে ধন্য হয়।

প্রশ্নাবলী :

১. 'খুকু ও খোকা' কবিতায় কবির যে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা করো।

২. 'চিল্কায় সকাল' একটি ক্ষণিক মুহূর্তের কবিতা হয়েও তা কালোত্তীর্ণ হবেছে - সে বিষয়ে মতামত দাও।

৩. 'অমরতার কথা' কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করো।

৪. 'উত্তরারিকার' কবিতার নামকরণের সর্থকতা বিচার করো।

NOTES

টিপ্পনী

NOTES

টিপ্পনী